চীনে মাটি

সন্তোষকুমার ঘোষ

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : : কলিকাতা—১২
১৯২২

—তিন টাকা—

এই লেখকের :

কিছু গোয়াল্লার গলি (২য় সংস্করণ)

নানা রঙের দিন

শ্রেষ্ঠ গল্প

শুক-সারী (যন্ত্রস্থ)

মিত্রালয় ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক
প্রকাশিত ও [illegible] ৭, বক্‌ স্ট্রীট হইতে
[illegible] সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

শশী বলল, মেমসাহেব খুব ভাল। দয়ার শরীর। চ', তোকে এখুনি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

কুঞ্জ বলল, এখন থাক শশীদা'। পরে। বরং মাটি কুপিয়ে নিই আরেকটু।

শশী বলল, না রে। বাইরের লোক বাগানের কাজে হাত দিলে সাহেব বড় গোসা হ'ন। আগে ঘরের লোক হয়ে যা। তখন সব তোকে শিখিয়ে দেব। কেয়ারি করা, জল ঢালা, ইস্তক সব ফুলের নাম।

—সব ফুলের নাম শশীদা' ?

—সব। চ' এবার,—শশী বলল, ভয় কিসের। মেমসাহেব সাহেব হলেও মেম তো। মেম মানে হল গিয়ে মেয়েমানুষ।

উলের কাঁটা থামিয়ে চোখ তুললেন মেমসাহেব।—কী শশী।

দণ্ডবৎ বিনয়ে শশী বলল, একে নিয়ে এলাম। আমার দেশের ছেলে। এখানে এক দিদির বাড়ি থাকত, জামাইবাবু তাড়িয়ে দিয়েছে। যদি কাজে ভর্তি করে নেন। সাহেবের খাস খানসামার কাজ একে দিয়ে বেশ হবে।

মেমসাহেব বললেন, আচ্ছা তুমি একে রেখে যাও। আমি দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করে দেখি।

সেলাম করে শশী বেরিয়ে যেতেই কুঞ্জর বুক ঢিপঢিপ শুরু হল।

সামনের একটা দেয়ালের আয়নায় ছায়া পড়েছে দু'জনের, সিল্‌ক-ঢাকা মোমের একটি মূর্তির পাশে ধুলোকালো ঝাঁকরাচুল এক ছোকরার। কুঞ্জর দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছিল, সে ধপ করে বসে পড়ল মেমসাহেবের পা ঘেঁষে।

শাদা ধবধবে দু'টি ননীনরম পা, আলগা ছুঁয়ে একটি হরিণাজিন চটি। কুঞ্জ তখনও কাঁপতে থাকল।

মেমসাহেব বললেন, আহা, মাটিতে বসলে কেন।

তা হোক, মাটিতেও কুঞ্জ কিছু কম সুখে নেই। মাটি কই, কার্পেট; মেজের লজ্জা ঢাকে, মানুষের পায়ের শব্দ ঢাকে। আর এখান থেকেও তো উড়ে উড়ে পড়া সিল্কের গন্ধ পাচ্ছে কুঞ্জ; মৃদু ঝিমঝিমে, কে জানে কী এসেন্স। দীর্ঘ দুটি ভুরুর নিচে দুটি চোখ, গলার একটা ভাঁজে ঈষৎ স্পষ্ট পাউডারের দাগ। মেমসাহেব বললেন, এখানে কোথায় থাকতে তুমি?

—পটলডাঙ্গায়।

—দিদির কাছে? কেমন দিদি? জামাইবাবু তাড়িয়ে দিল? কী কাজ করে তোমার জামাইবাবু?

কুঞ্জ একটা ছাপাখানার নাম করলে।

আরো দু'একটা টুকটাক কথা জিজ্ঞাসা করলেন মেমসাহেব। বোধহয় খুশি হলেন। উলকাঁটা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, দীর্ঘশিখা দেহ, আঁচল কুড়িয়ে নিলেন।

—বেশ আজ থেকেই কাজ করবে তুমি।

শীর্ষরক্তাভ শুভ্র আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে পলক পড়ল না কুঞ্জর। এত সুষমা থাকতে পারে শরীরের গঠনে? চকিতে বকুলদির কথা মনে পড়ল। ধোঁয়াজ্বালা রান্নাঘরে বাটনা বেটে-বেটে ক্ষয়ে যাওয়া কটি আঙুল, থেঁৎলানো, ভোঁতা। এই সতেরো বছর পর্যন্ত যত মেয়েমানুষ দেখেছে কুঞ্জ, তাদের কারুর সঙ্গে এই মেমসাহেবের তুলনা নেই—এই সুষমা, এই মহিমা কোথায় পাবে তার চোখ-বসে-যাওয়া, কণ্ঠা-উঁচু, হাড়কালি, স্বামীর ভয়ে জুজুবুড়ি বকুলদি।

কুঞ্জ বলল, আমাকে রাখলেন মেমসা'ব? কিন্তু, কিন্তু সাহেব—

মেমসাহেব হাসলেন,—সাহেবের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার কথাই শেষ কথা। সাহেব কিছু বলবেন না।

ঠিক তখুনি বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

তালিম দেওয়াই ছিল। মশ্‌মশ আওয়াজ হতেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, কাঠপুতুল, জোড়াগোড়ালি এ্যাটেন্‌সন।

—কে?—চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, অর্ধমনস্ক পাখাটাকে পুরোদম করে দিয়ে।

ইন্দ্রাণী বললেন, নতুন লোক। বাহাল করলুম আজ থেকে। উড়েটাকে দিয়ে কোন কাজ পাওয়া যেত না।

চৌধুরী বললেন 'ও', শুনলেন কিনা সন্দেহ, টুঁটিটেপা টাইটাকে ঢিলে করতে গলায় হাত দিলেন।

কুঞ্জর হাত ততক্ষণ সাহেবের জুতোর ফিতেয় পৌঁছে গেছে। চৌধুরী সাহেব বাধা দিলেন না, কৌচে গা ঢেলে দিয়ে বললেন, বেশ চটপটে।

খাওয়া-শেষে চৌধুরী বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটান, ঠিক ওলটান না, পাখাতেই ওলটায়, সাহেব ধরে থাকেন মাত্র, কয়েক মুহূর্তের ঝিমুনি, ঘোড়াঘুম। মেমসাহেব সেই অবসরে পশমের কাঁটা নিয়ে বসেন, পায়ের কাছে কুকুরটা মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গকুণ্ডলী।

কুঞ্জ বারান্দায় এল। বিকেলবেলার একটুখানি রোদ, বাগানের ঝাউগাছের পাতার পাহারা এড়িয়ে যতটুকু পড়তে পারে। দেয়াল ঘেঁষে একটা লতা, টকটকে ফুল। তারপর যতদূর চাও, শুধু ফুল, যত্ন করে লাগানো, কুঞ্জ নাম জানে না। এখানে ওখানে ছোট ছোট গাছ, বেশি বাড়েনি, কিন্তু স্তবকের মত, সমান করে ছাঁটা। আজ আট মাসের ওপর কুঞ্জর চুলে কাঁচি পড়েনি, কিন্তু এ-গাছগুলোর দশআনা চারআনা ছাঁট নিয়মিত।

আস্তে আস্তে কুঞ্জ নেমে এল নিচে, সাবধানে, ঘাস বাঁচিয়ে সুরকিপথ ঘেঁষে। এ-বাগানে ঘাসেরও চাষ হয়।

শশীর ঘরে তখন টোয়েন্টি নাইনের ধুম। এ-পাশের বাংলো থেকে এসেছে সতীশ, ও-পাশ থেকে মধু, সামনের বাড়ির ড্রাইভার নিত্যানন্দও।

কুঞ্জকে দেখে শশী উঠে এল।

—কিরে, ঠিক হল কিছু?

কুঞ্জ হাসি-হাসি মুখে সব বললে।

কেমন-বলেছিলাম-কিনা ঢঙের মাতব্বরী গলায় শশী বলল, তা তুইও তো কম হাঁদা না। মেমসাহেব তোকে রাখলেন, তুই আবার সাহেবের কথা তুলতে গেলি কেন। আরে হাঁদারাম, একি তোদের-আমাদের ঘরের বৌঝি পেয়েছিস যে সোয়ামীর মত না নিয়ে এক পা চলা নেই? আমাদের মেম সাহেব হলেন স্বাধীন, নামে মাত্তর ইস্ত্রী। উনি ক'টা সমিতির পিসিডেন, জানিস?

কুঞ্জ জানত না, বড়বড় চোখে চেয়ে রইল।

শশী বলে গেল, এখানে বরাত জোরে টিঁকে যাস যদি, সব জানবি। শুধু আমাদের মেমসা'ব কেন, লেডী অপর্ণা, মিসেস চাকলাদার—এঁদের সব্বাই। এঁরা সব অন্য জাতের জেনানা রে! তুই এখন ফিরে যা। সাহেবের বেরোবার সময় হয়েছে।

সাহেব বেরোলেন না, বেরোলেন ইন্দ্রাণী। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, হাই তুললেন ছোট্ট করে, পেশীর কুঞ্চন ঢাকতে একটা হাত মুখের সমুখে ধরলেন।

তারপর যে-হাতে মুখের কুঞ্চন ঢেকেছিলেন সেই হাতের ইসারায় ডাকলেন কুঞ্জকে।

কুঞ্জ ছুটে এল। কুঞ্জর গন্ধ পেয়ে ঘর থেকে ছুটে এল লুপি। যে হাতের ইসারা করে ইন্দ্রাণী ডেকেছিলেন কুঞ্জকে, সেই হাতের ইসারাতেই চুপ করতে বললেন কুকুরকে। কুঞ্জকে বললেন, অত শব্দ করে ছোটে? লুপি ভয় পেয়েছিল। সাহেবের যদি ঘুম ভেঙে যেত!

লজ্জা-ভয়ে কুঞ্জ বলল, ও।

ওকে দিয়ে দু'একটা টুকরো কাজ করিয়ে নিলেন মেমসাহেব। তারপর কক্ষান্তরে গিয়ে নতুন বেশে পরিবর্তিত হয়ে এলেন। বললেন,

আমি একটু বেরুচ্ছি কুঞ্জ। তুমি একটু ব'স। ঘুম ভাঙলে সাহেবের যদি কিছু দরকার হয়।

মেমসাহেব বেরিয়ে যাবার পরও ঘরে এসেন্সের গন্ধ রইল। উনি গিয়ে গাড়িতে পা দিলেন, অমনি ইঞ্জিন প্রাণবন্ত হল; সিটে মাথা এলিয়ে দিলেন, অমনি চাকা গড়াতে সুরু করল। পেট্রোলের গন্ধে চাপা পড়ল এসেন্সের, তারপর দুটোই মিলিয়ে গেল, কুঞ্জর চমক ভাঙল তখন।

একটু পরেই ঘুম ভাঙল সাহেবের। চোখের কোণ অল্প অল্প লালচে। আস্তে আস্তে বার দুই ডাকলেন, 'ইন্দু, ইন্দু।'

সাড়া না পেয়ে বড় করে চোখ মেললেন। দেখলেন কুঞ্জকে। —মেমসাব কই রে।

—এক্ষুনি তো বেরুলেন।

মেমসাহেবের ভয় করেনি, করছে কুঞ্জর। সাহেবের হুকুম না নিয়ে বেরিয়েছেন, যদি সাহেব ক্ষেপে যান।

সাহেবে কিছুই করলেন না, শুধু বললেন, এক্ষুণি? কটা বেজেছে। সাড়ে চার—তাইতো।

নিজেই ঢুকলেন গোসল ঘরে।

এই গল্পটাই কুঞ্জ ক'দিন পরে রসিয়ে-রসিয়ে করেছিল বকুলদির কাছে।

কপাল খুলে গেছে কুঞ্জর। সাহেবের কখন কী দরকার হয়, সেই জন্যে খাসদালানের বারান্দার কোণে একটা কুঠুরিতে ওকে আস্তানা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়। দুটো কামিজ কিনতে ওকে পুরোপুরি দশ-টাকার নোট দিয়েছেন মেমসাহেব। তার থেকে তিনটি টাকা বাঁচিয়ে কুঞ্জ বকুলদিকে দিতে গিয়েছিল।

বকুল মহা খুশি।—চাকরি পেয়েছিস, সত্যি কুঞ্জ? সাহেব-বাড়ি? সত্যিকারের নয়, কিন্তু অত কথা বকুলদিকে ভেঙে বলবে কেন। মেমসাহেব কথাটাই হাজারবার ব্যাখ্যান করে শোনাল কুঞ্জ। কেমন

সোজা, কেমন স্বাধীন। একলা-একলা বেরিয়ে যান গাড়ি করে, কাকস্য পরোয়া।

গালে হাত দিয়ে শুনছিল বকুল। সব শেষে বলল, অথচ তোর জামাইবাবুকে না বলে সিনেমায় গেছলাম বলে সেবার আমাকে কী মারটাই না মেরেছিল, তোর মনে নেই কুঞ্জ ?

মনে আবার নেই।

ঘোড়া-গাড়ি করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে একদল লোক সকালের দিকে সিনেমার হ্যাণ্ডবিল বিলি করে গিয়েছিল; তারই একটা কুড়িয়ে রেখেছিল বকুলদি। বেলা পড়তেই দেখিয়েছিল কুঞ্জকে।—চট করে দুটো টিকিট নিয়ে আয় তো ভাই।

—টাকা ?

সে বন্দোবস্তও বকুলদি করেছে বইকি। পুরনো কাপড় আর ফুটো বাসন বেচে আজই পেয়েছে টাকা—নগদ দুটাকা দশ আনা। এ-টাকার খবর প্রাণকৃষ্ণ রাখেনা।

কুঞ্জর তবু হাত সরেনা, পা পড়ে না। বলল, জামাইবাবু জানলে বকবেন।

—টের পেলে তো।—বকুল ভরামুখ হেসে বলল,—কদিন থেকে ওভারটাইম খাটছে, রাত দশটার আগে বাবু ফেরেনই না। আমরা তার আগেই ফিরে আসব, দেখিস। বিকেলের রান্না সেরে রেখে দিইচি, ফিরে এসে দু'খানা রুটি সেঁকে নোবো'খন।

সেদিনই প্রাণকৃষ্ণ ফিরেছিল তাড়াতাড়ি। পুরোঘণ্টা কাজ শেষ হতে ছুটল ওভারটাইমের লিস্টি দেখতে। নাম নেই। মেজাজ গেল বিগড়ে। শালা, দুটো পয়সা উপরি আয়ের যদি জো থাকে। মুখ দেখে দেখে খাতিরের লোক বেছে বেছে লিস্ট তৈরি হয়। ফিরে এসে বাড়িতে দেখে বৌ নেই। সিঁড়ির ধাপে বসে একটার পর একটা বিড়ি টেনেছে প্রাণকৃষ্ণ।

সেই বিড়ির আগুন কুঞ্জ দেখতে পেলে গলির মুখ থেকেই। বুঝলে

বেগতিক। বুকের ভেতরটা হিমহিম লাগল। একটু খোলা বাতাস পুরে নিতে কুঞ্জ পিছিয়ে রইল।

গ্যাসের আলো গলির ইদিকে নেই। একটা কেরোসিনের ডিবে আছে, সেটা আবার রোজ জ্বলেনা। তবু দেখতে পেলে প্রাণকৃষ্ণ শক্ত করে ধরেছে বকুলদির চুলের মুঠি, রাবণ যেমন করে সীতায় ধরেছিল। হিড়হিড় করে প্রাণকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল বকুলদিকে।

অনেকক্ষণ পরে পা টিপে টিপে ফিরে এসেছিল কুঞ্জ। সারাটা রাত রকে শুয়েই কাটল। আকাশের গায়ে কাঁটা দেওয়া অজস্র তারা। কিন্তু সেদিকে তো চোখ নেই কুঞ্জর। ওর নিজের গায়েও কাঁটা দিয়েছে। হয়ত কার্ত্তিকের হিমে; হয়ত অনেকক্ষণ ধরে বকুলদির কান্না শুনে শুনে।

পরের দিন, প্রাণকৃষ্ণ কাজে বেরিয়ে গেলে বকুলদি ওকে কালো কালো দাগ দেখিয়েছিল। শুধু তাই না। নাকে, গালে, কানের লতিতে অনেকগুলো ছড়ে-যাওয়া দাগ।

—জামাইবাবু বুঝি দেয়ালে তোমার মুখ ঘষে দিয়েছিল বকুলদি? গলাটাকে করুণ করে কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করেছিল।

ফিক করে হাসল বকুল,—দূর বোকা, এসব দাগ অন্য জিনিষের। তুই বুঝবিনা। একটু থেমে বলল, এ হ'ল ভালবাসার। ভালবাসারও আঁচড় পড়ে, জানিস?

কুঞ্জ তখনো অবোধ চোখে চেয়ে আছে দেখে বকুল বলল, সত্যি কাল আমাদেরই দোষ হয়েছিল ভাই। মেয়েমানুষ, সোয়ামীর অধীন। কত্তার হুকুম না নিয়ে আমাদের বেরোনো উচিত হয়নি।

দিদি মানে হল বকুলদি—পাড়া সম্পর্কে। বয়সে বছর দুই-এর বেশি বড় না। আগে বুঝি কুঞ্জ নাম ধরেই ডাকত, সেই পুকুরে চান করা, ফুল তোলা, ফল চুরি করার আমলে।

তারপর বকুলের বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র প্রাণকৃষ্ণ কলকাতায় চাকরি করে।

৮

বিয়ের পর একবার বাপের বাড়ি ফিরে গেল বকুল, চওড়াপাড় শাড়ি, মোটা টানা সিঁদুর। দু'বছরের বড় তো ছিলই, আরো যেন বছর দুই বয়স বাড়িয়ে এল।

ভাইবোনের খাতার পাতা ছিঁড়ে বকুল বরকে ভারি ভারি চিঠি লিখত, সেই চিঠি ডাকে দিতে হত কুঞ্জকেই। খামের ওপরে যত্নকরে-লেখা ঠিকানাটা দেখে দেখে ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

এবারে কলকাতা পাড়ি জমাবার আগে সেই ঠিকানাটুকু কাগজে লিখে এনেছিল কুঞ্জ। রাস্তাঘাট ঠাহর হতে হতে লাগল দিন চারেক। এ ক'দিন ফুটপাতে শুয়েছে, খেয়েছে মুড়ি, কলের জলে ভিজিয়ে। তারপর অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছেছিল ঠিক।

খোলার দোচালা, টিনের বেড়া, দর্মার ঝাঁপ, চটের পর্দা। বুকটা দমে গিয়েছিল, তবু ফুটপাতের চাইতে ভাল। ভরসা করে দরজায় টোকা দিলে।

বকুল ছিল রাস্তাতেই, একটা বে-আব্রু কলে চান করছিল। অচেনা লোক দেখে শপ্‌শপে কাপড়ে ফিরে এল তাড়াতাড়ি, ঘড়াটা মাটিতে রেখে, ঘোমটাটা টেনে দিল।

কুঞ্জ দেখল, শুকনো সিকলিকে হাত, চোখে কালি, আরো বছর চারেক বয়স বেড়েছে বকুলের।

আর নাম ধরে ডাকা চলল না। বলল, বকুলদি?

বকুল বলল, কুঞ্জ! আমি বলি কে না কে। আয় ঘরে ব'স। কবে এলি।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল বকুল। মাসিমা নেই? কবে গেলেন। মেসোমশাই নিরুদ্দেশ? আহা। এখানে থাকবি বলে এসেছিস, ভাল কথা। কিন্তু বড় যে মুশকিলে ফেললি ভাই। এই তো দেখছিস ঘরদোরের অবস্থা, শুতে দিই কোথায়? তোর জামাইবাবুর তো ছাপাখানায় সামান্য কাজ, আমাদেরই চলেনা।

তা হোক, তবু ওরই মধ্যে বন্দোবস্ত হয়ে গেল। রকে শোবে কুঞ্জ,

যা হোক দু' মুঠো পাবে। চেনা আরেকটা ছাপাখানায় কুঞ্জকে প্রুফতোলার কাজ জুটিয়ে দেবার ভরসা দিল প্রাণকৃষ্ণ।

বদলি কি প্রাণকৃষ্ণরই কম হয়েছে। বিয়ের সময় ছিল বাগানো টেরী তেল-চপচপে চুল, ছোকরা ছোকরা দেখাতো। এবার কুঞ্জ দেখল, প্রাণকৃষ্ণর মাথার সমুখের দিকটা অনেকটাই ফর্সা হয়ে এসেছে, পেছনের দিকে যা কয়েক গোছ চুল আছে তার অনেকটাই শাদা। সামান্য দু'চার বছরে এতটা বয়স বেড়ে যায় মানুষের! সেবারে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ঘন ঘন কাঁচি সিগারেট ফুঁকত; এবারে বিলকুল খাঁকি তাও হিসেব করে প'হরে প'হরে ফোঁকে, খুক খুক কাশে।

তা কাশুক, প্রাণকৃষ্ণর মুখের বড়াই আছে তেমনি। প্রথম আলাপেই কুঞ্জ বলেছিল, আপনি একটা কাজ জুটিয়ে দিন জামাইবাবু। ছাপাখানার আপনিই তো ম্যানেজার।

ম্যানেজার? প্রাণকৃষ্ণ বলল, না ঠিক ম্যানেজার আমি নই। তবে বলতে পার বটে। ম্যানেজার নামে যেটা আছে সেটা ছাপাখানার কাজের বোঝে কী। আমাকেই সব চালাতে হয়। বিশ বচ্ছর কম্পোজ করছি, ক' সিলিপে ক' ইঞ্চিক, চোখ বুলিয়ে বলে দেব। পারবে তুমি বলতে? পারবে আমাদের গ্র্যাজুয়েট মুখুজ্যে? ম্যানেজার হতে কত প্রেস থেকেই তো কত সাধাসাধি করে। যাইনে। বোয়েচ ভায়া, পুরনো চাকরি। তা-ছাড়া ও-সবে অনেক ঝকি—তা দেবো তোমাকে একটা কাজ জুটিয়ে।

দিলও শেষ পর্যন্ত। প্রুফটানার কাজ। এ-কাজটা সহজ, শিক্ষা-নবিশি নেই, সাকরেদি নেই, দিনকতক গেলি টানাটানি করলেই ওস্তাদ।

মাইনেপত্তর ঠিক হল কিনা, কত ঠিক হল কে জানে, প্রাণকৃষ্ণ জানতে দিল না কুঞ্জকে। বলল, এখন শুধু খেটে যা। মইয়ের নিচের ধাপে আছিস, নজর রাখবি ওপরে, ওই ম্যানেজার মুখুজ্যে যেখানে বসে আছে, তোকে গিয়ে পৌঁছতে হবে ওখানে, বুইচিস।

ছিল বেশ। দুটো খেত, পরত, শুত—কোনদিন রকে, জোর বিষ্টির দিনে সিঁড়ির নিচে চাদর বিছিয়ে।

ভোর সাড়ে আটটায় বেরিয়ে যেত প্রাণকৃষ্ণ, কুঞ্জ তারো কিছু পরে। আগে কম্পোজ হবে তবে তো প্রুফ।

বাজার করে নিয়ে এসে কুঞ্জ দেখতে পেত কাঁখালে করে রাস্তা থেকে জল তুলে আনছে বকুলদি, পারছে না। কোমর বেঁকে গেছে, ঠোঁট দুটো আলগা। আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে।

ছুটে যেত কুঞ্জ। সরো বকুলদি, আমি ধরে দিচ্ছি জল।

এই ক' বছর শ্বশুরঘর করে, জল টেনে, বাসন মেজে আর উনুন ধরিয়ে ধরিয়ে শরীরে আর কিছু নেই বকুলদির; শুকিয়ে কাঠিসার তো হয়েছেই, সবটুকু লাবণ্য ঝরে গেছে।

সবটুকু বুঝি নয়। এখনও যখন কাপড় কেচে, গা ধুয়ে ঘরে এসে ঢোকে বকুলদি, অনেক কষ্টে দরজার কবাটের আড়াল করে ওর দিকে পেছন ফিরে কাপড় ছাড়ে, হাত-আয়না সমুখে রেখে টেনে টেনে চিরুণী চালায়, কুঞ্জর চোখে ধাঁধাঁ লাগে। অনেক দিন আগে দেখা ওদের গ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামল কিশোরীকে মনে পড়ে। এখনো তবে একেবারে মরে যায়নি বকুলদি, ফুরিয়ে যায়নি। এখনও যদি একটু জিরিয়ে নিতে পারত, খেতে পারত পেট ভরে, তবে বকুল আবার তাজা হয়ে উঠতে পারত, বাতাস লাগত হাড়ে, গালে মাংস, রক্ত আসত শরীরে।

কিন্তু শুধু খেতে পেলেই কি সুখী হত বকুল। প্রাণকৃষ্ণ খেয়ে উঠে গেছে, পাতের কাছে বসে বকুলদিকে শুকনো মাছের কাঁটা চুষতে দেখে কুঞ্জর তাই মনে হয়েছে বটে, কিন্তু ভাল করে নজর করে মাঝে সন্দেহ হয়েছে, শুধু খাওয়াপরা আর বিশ্রামের অভাবই বকুলদির আসল অসুখ নয়, আরো কিছু আছে।

প্রাণকৃষ্ণর এঁটো তুলে নিতে এসে থালার চারপাশে লেগে থাকা দু চারটে ভাত কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেত বকুলদি। কোন কোন দিন কুঞ্জর চোখে ধরা পড়ে গেছে।

—তোমার বুঝি আজ খাওয়া হয়নি, বকুলদি ?

এক রকম হাসি ফুটত বকুলদির মুখে। লজ্জা ঢাকে হাসি, কিন্তু হাসির দৈন্য ঢাকে কিসে।

—হবে না কেন, তাই বলে জিনিষ নষ্ট করব কেন। তোর একদম বুদ্ধি নেই কুঞ্জ।

বুদ্ধি আছে প্রমাণ করবার জন্যেই কুঞ্জ হয়ত মাঝে মাঝে পাতে আদ্ধেকটা ভাত ফেলে রেখে উঠতে গেছে। বকুল তা হ'তে দেয়নি। —ভাত নষ্ট করছিস যে ?

—খিদে নেই। তাছাড়া নষ্ট হবে কেন।

—কে খাবে তোর পাতেরটা।

ভয়ে ভয়ে, কতকটা চোখ বুজে কুঞ্জ বলেছে, কেন তুমি।

বকুল চটে উঠেছে, কিম্বা ভাণ করেছে।—এই বুদ্ধি হয়েছে তোমার এত বয়সে। সোয়ামীর প্রসাদ খেলে পুণ্যি হয়, তোর পাতেরটা খেলে আমার কি।

কুঞ্জ বলতে চেয়েছে, 'আমার পুণ্য হবে', কিন্তু কথা সরেনি।

কিন্তু আসলে তো খেতে পাওয়ার দুঃখই শুধু নয় বকুলের, আরো একটা আছে। ভয়।

এই ভয় স্পষ্ট নয়, প্রত্যক্ষ নয়, তবু আছে। বাতাসের মত, নিঃশ্বাসের মত, অজানিতে চোখের পলক পড়ার মত।

বিকেলে গা ধুয়ে এসে ভাল একখানা কাপড় পরে বৈকি বকুল, প্রাণকৃষ্ণর জন্যেই পরে ; তবু, কুঞ্জর দেখতে ভুল হয়নি, সদর দরজায় প্রাণকৃষ্ণর গলার আওয়াজ শুনলেই মুখে কেমন একটা ছায়া নামে।

সে-ছায়া অবশ্য মিলিয়ে যায় মুহূর্তেই। একটু পরে হাসে বকুলদি, বকুলদিকে হাসতে হয়।—আজ এত দেরি ?

সারাদিন পরিশ্রমের পর মেজাজ তিরিক্ষি প্রাণকৃষ্ণর। ঘর্ঘর গলায় কী বলে বোঝা যায় না। তারপর হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে দু'একটা ইয়ার্কিও দেয় বৌয়ের সঙ্গে। বকুলদিও হাসে, হাসতে হয়। তবু সে

হাসি, কুঞ্জ ঠিক ধরতে পারে, পেতলের কলসির কানার মত ; অন্তরের ছায়া লুকিয়ে যায়, ঘোচে না।

শুধু বকুলদি কেন স্বামীস্ত্রী সম্পর্কে কুঞ্জর অভিজ্ঞতাই এমনি। এই বস্তিতে আরো তো ক'ঘর পরিবার আছে। ও-পাশে ললিতাদি এ-পাশে নীলুদিরা। এমনিতে বেশ আছে। স্বামীর জন্যে রান্না করে, জামা রিপু করে, একসঙ্গে শোয়, বছর বছর বিয়োয়, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের পর্দা দুলতে থাকে। একই সুখ, একই দুঃখের শরিক দু'জনে, তবু দু'জন যেন সমান নয়। একে প্রভু, অপরে দাসী।

নইলে সামান্য একটু অন্যমনস্কতার জন্যে ভাতটা একটু ধরে যায় যেদিন, সেদিন বকুলদির মুখ অমন শুকিয়ে যায় কেন, চোখে মুখে ফুটে ওঠে কেন আতঙ্ক। বলে, আজ তোর জামাইবাবু আমাকে আস্ত রাখবে না কুঞ্জ। কী করে ধরে গেল বল দেখি।

অবশ্য প্রাণকৃষ্ণও বলে। হাসতে হাসতে। একবারে পাঁচসিকে পয়সা বাজী ধরেছিল রেসে। কিছু ফিরে আসেনি। ছাপাখানার কালি ধুয়ে মুছে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রাণকৃষ্ণ বলেছিল, তোর দিদি একেবারে ক্ষেপে যাবে কুঞ্জ। কাপড়কাচা সাবান, সুতো আর মশলা কেনার পয়সা হিসেব করে দিয়েছিল। ওকে আমি কৈফিয়ৎ দেব কী। বলতে বলতে গলাটাকে ভারী করে আনে প্রাণকৃষ্ণ, চোখমুখও গম্ভীর, তবু কুঞ্জ জানে সব কৃত্রিম। বকুলদির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা রাখে না প্রাণকৃষ্ণ। যেমন রাখেনা পাশের ঘরের ললিতাদির স্বামী পশুপতি।

এক একদিন বাসায় ফিরতে পশুপতির খুব রাত হয়ে যায়। দরজার ওপর দুমদাম আওয়াজ করে। ললিতা যদি বলে, আজ আবার ওসব খেয়েছ,—মুহূর্তে বিনয়ে কাদা হয়ে যায় পশুপতি। ধরাধরা গলায় বলে, মাইরি না। আর কোনও দিন ওসব ছোঁব না। এই তোমার পা-ছুঁয়ে বলছি—

পা ছুঁতে যায় বটে, তখন শখের জোয়ারের পর অনুতাপের ভাঁটা চলছে, কিন্তু সত্যি কি আর ছোঁয়, না ললিতাদি ছুঁতে দেয়।

এর পরও যদি বুঝেসুঝে চুপ করে না যায় ললিতাদি, অমনি বিনয়ের খোলস ছেড়ে ফুঁসে উঠবে পশুপতি, দু'চার ঘা বসিয়ে দেবে।

এসব দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে কুঞ্জর। তবু দিন মন্দ কাটছিল না, কেটে যেত-ও, যদি না প্রাণকৃষ্ণর চাকরিটা অমন হঠাৎ চলে যেত।

গেল, কাজে ঢিলেমির জন্যে নয়, গরহাজিরার জন্যে নয়, সীসে চুরির দায়ে। কিছুদিন থেকেই টাইপ কমতে সুরু করেছিল, কেস-কে-কেস দুদিনে খালি। নজর রাখা শুরু হল। সাতদিনের মাথায় ধরা পড়ল প্রাণকৃষ্ণ, হাতেনাতে। সঙ্গে সঙ্গে সাফ জবাব হয়ে গেল। থানা পুলিশ হলনা, বিশ বছরের চাকরি। বাবুরা মাফ করলেন। কিন্তু চাকরিটি কেটে দিলেন। সেই সঙ্গে কুঞ্জরও। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই নয়, শালাভগ্নীপতিও হয়। কে না জানে কুঞ্জ প্রাণকৃষ্ণেরই লোক।

সব শুনে গুম হয়ে বসে রইল বকুল।

—এবারে কী উপায় হবে।

প্রাণকৃষ্ণ ভরসা দিল, কিছু ভেব না, একটা জুটবেই। এত বছর ধরে আছি এ-লাইনে।

জুটল না তত সহজে। কেলেঙ্কারির খবর দ্রুত ছড়ায়। সবাই কী করে টের পেয়ে গেছে চুরির দায়ে বরখাস্ত হয়েছে প্রাণকৃষ্ণ।

আরো মাসখানেক কাটল।

এই এক মাস প্রাণকৃষ্ণ বসে থাকেনি। চায়ের দোকানের রকে বসে বসে অব্যর্থ ঘোড়ার কুষ্ঠিকুলুজী বিচার করেছে। পাঁচ ধরে দশ আনা ফেরৎ এসেছে এইমাত্র, তাতে সংসার চলেনা।

বকুলের সঞ্চয়ের শেষ কড়ি পর্যন্ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে এল, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণর আশা অক্ষয়। রোগা জিরজিরে বুকে চাপড় মেরে বলল, সবুর, আর ক'টা দিন। একটা হদিশ পেয়েছি। ঠিক মত গেঁথে তুলতে পারলেই, ব্যস, পায়ের ওপর পা থুয়ে—বুঝলে বকুল। বকুল ভাষাহীন, ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে থাকে। বোঝে কিনা বোঝা যায় না।

একদিন বিকেলে এসে তাড়া দিলে প্রাণকৃষ্ণ। চটপট তৈরি হয়ে নাও তো বকুল, সিনেমায় যাব।—সিনেমা! সকালে শুধু মুড়ি খেয়ে কেটেছে, ও বেলার জন্যে তাও নেই। বকুল বলল,—সিনেমা!'

ধমক দিল প্রাণকৃষ্ণ। হাঁ করে তাকিয়ে থেকোনা, যাও সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে এস, চটপট।

সাবান কোথায়?

কেন ললিতার কাছে ধার করে চালিয়ে নাও না। দেবে না? আলবৎ দেবে।

যতক্ষণ শাড়ি বদলাল বকুল, ততক্ষণ প্রাণকৃষ্ণ ওর প্ল্যান উন্মোচন করল। আরে, জোর একটা টিপ্‌স্ পেয়ে গেছি। নিরুপমা পারফিউমারির নাম শুনেছ।

পারফিউমারি কি বস্তু বকুলের জানা ছিল না।

সাবান, তেলের কোম্পানী আর কী। আজ ললিতা তোমাকে সাবান মাখতে দিতে খুঁৎ খুঁৎ করছিল, দু'দিন বাদে তুমি ওকে বাক্সবাক্স সাবান দিতে পারবে। তবে আমরা এখানে আর থাকব না এই যা।

আঁচলটা বেড় দিয়ে সবে মাথার ওপর তুলছিল বকুল, হঠাৎ ওর হাত আলগা হয়ে গেল।—এখানে আর থাকব না!

বাহাদুর গলায় প্রাণকৃষ্ণ বলল, তবে আর বলছি কেন। নিরুপমা পারফিউমারির অর্গানাইজার সুবোধ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমাকে ওরা বাইরে পাঠাতে চায়—বিহার উড়িষ্যার সোল এজেন্ট করে। মালটা চালাতে হবে আর কী। ট্রেনে ট্রেনে ঘোরাঘুরি করে—

এতক্ষণে বকুল বুঝতে পেরেছে।—ফিরিওয়ালা হবে তুমি?

কম্পোজিটারের বৌ বকুল। সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে বড় হুঁশিয়ার। ফিরিওয়ালা তো আরো এক ধাপ নিচে।

—আরে দূর দূর। ফিরিওয়ালা হতে যাব কেন। আমার অধীনেই কত ফিরিওয়ালা থাকবে দেখ। এই কুঞ্জ ছোঁড়াটাকেও আমি একটা কাজ দিয়ে দেব। এসব কাজে বহুৎ দায়িত্ব বকুল, বিস্তর টাকা জমা

দিলে তবে জোটে। নেহাৎ সুবোধ চক্রবর্তীর আমাকে খুব মনে ধরেছে তাই—

তাই সুবোধ চক্রবর্তীর পয়সায় সিনেমা যেতে হল।

সিনেমায় কী হয়েছিল, সেদিন বোঝেনি কুঞ্জ। ফিরে এসে বকুল ভালমন্দ কিছুই বললে না। কেমন গল্প, ক'টা গান, কিছু না। কুঞ্জও জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলে না।

দিন তিনেক বাদে প্রাণকৃষ্ণ বলল, চটপট তৈরি হয়ে নাও। বিকেলে বেড়াতে যাব। সুবোধ চক্কোত্তি আসবে গাড়ি নিয়ে।

বকুলের মুখ মড়াফ্যাকাশে হয়ে গেল, প্রাণকৃষ্ণ সেটা নজর করল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু কুঞ্জ দেখে নিয়েছে ঠিক।

—আজকে? আবার!

বিবর্ণ মুখ প্রাণকৃষ্ণ দেখতে পায়নি' কিন্তু বিরস গলা শুনল ঠিক। চটে গিয়ে বলল, কী রাজকার্য করছ এখানে বল দেখি। সুবোধ চক্কোত্তির মেলা পয়সা বকুল, খাবার লোক নেই, লোকটা তাই মনমরা হয়ে থাকে। নইলে টাকাকে টাকা জ্ঞান করে না। আজ ধরেছে ডায়মণ্ডহারবার যাবে।

—যাক না। বকুল বলল, যত খুশি বেড়িয়ে বেড়াক। আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন।

কথার ছিরিতে প্রাণকৃষ্ণ ক্ষেপে গেল ;—টানাটানি আবার কিসের। যেতে ইচ্ছে হয় যাবে, না হয় যাবে না।

স্থির চোখে একবার স্বামীর চোখের দিকে তাকাল বকুল, বলল, বেশ, চল।

ফিরে এসে সটান শুয়ে পড়ল। কুঞ্জ আগেই মুড়ি-বাতাসা খেয়ে নিয়েছিল। সেদিন আর উনুন জ্বলল না।

নাটকীয় সেই ঘটনাটা ঘটল আরো দিন চারেক পরে।

একটা টাকা দিয়ে লোকটা ওকে ফরমাস করল, যাওতো খোকা, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এস, আর দু'খিলি পান।

ঝাঁঝাঁ দুপুর—দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, ফিরে আসতে কুঞ্জর মিনিট পনেরো লাগল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে যাবে, পারল না।

রুদ্ধশ্বাস বকুলদি, আরক্তমুখী বলছে, যান, এখুনি বেরিয়ে যান আপনি। নইলে—

মিটি মিটি হাসছে সুবোধ।—নইলে কী।

—নইলে উনি এসে আপনাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবেন।

—প্রাণকেষ্টোর কথা বলছ?—তেমনি হাসছে সুবোধ,—আরে না, সে আসছেনা বকুল, তোমার ভয় নেই। প্রাণকেষ্টকে মোড়ের দোকানে বসিয়ে এসেছি, সে এখন চিংড়ির কাটলেটের কাঁটা চুষছে।

সেই মুহূর্তে কী হল কুঞ্জর, ঘরে ঢুকল ঝড়বেগে, অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবোধের গায়ে, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে শুধু নখে রক্তক্ষত করে দিতে থাকল।

ছিটকে পড়ল অবশ্য মুহূর্তেই। সুবোধ চক্রবর্তী লিকলিকে হলেও কুঞ্জর মত পুঁচকেকে কায়দা করার জোর রাখে। মেজেয় ঠোকর খেয়ে কেটে গেল কপালের খানিকটা, আর, তখন আর, জ্ঞান রইল না কুঞ্জর। হাতের মুঠোয় ছিল খুচরো ক'আনা পয়সা, দেশলাই, সিগারেটের প্যাকেট। সব আবীরছোঁড়ার মত ছুঁড়ে দিল সুবোধের চোখ লক্ষ্য করে। চশমাটা চুরমার হয়ে পড়ল মাটিতে, তারই দু' একটা টুকরো বিঁধে থাকবে সুবোধের চোখে। দু'হাতে মুখ ঢেকে সুবোধ মাথাহেঁট অপমানে ঘর থেকে সুড়সুড় বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সে তো শুধু প্রথমাঙ্কের যবনিকা। প্রাণকৃষ্ণের প্রবেশ হল বেলা গড়িয়ে যেতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, সুবোধ আসেনি?

হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল বকুল, এতক্ষণে ভেঙে পড়ল কান্নায়। গোঙানির সঙ্গে ইনিয়ে বিনিয়ে কী বললে, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল না কুঞ্জ।

প্রাণকৃষ্ণ ততক্ষণে কঠিন হাতে ঠেলছে বকুলকে।—যাওনি, যাওনি তবে সুবোধ চক্কোত্তির সঙ্গে?

মিনমিনে স্বরে বকুল একবার বলতে চেষ্টা করল, তুমি ছিলে না—

—সতীনোকৃথি! কই পাতানো ভাইয়ের সঙ্গে গলাগলি করে যাওয়ার সময় এই হিসেব তো ছিলনা। ওর সঙ্গে কিসের এত গুজগুজ ফুসফুস। ও শালাকে আজই মেরে তাড়াব।

দম নিল প্রাণকৃষ্ণ, ফের হতাশার ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে শুরু করল: আর কী, যা কিছু আশা-ভরসা ছিল, সব ফর্সা হয়ে গেল। কী খোয়া যেত তোমার সুবোধের কথাটা রাখলে। আর মাস খানেকের মধ্যেও একটা কাজ যদি না জোটাতে পারি, তখন কোথায় থাকবে তোর এক তেজ। বেশ্যাবিত্তি করেও কুল পাবিনি।

মেরে তাড়াতে হল না, কুঞ্জ সেদিন নিজে থেকেই সরে পড়ল। তারপরেও কিন্তু একদিন লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিল বকুলের সঙ্গে। দেখল তালা বন্ধ।

মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, দেখল গাড়ি থেকে নামল বকুল।

ভাঙ্গা চশমা জোড়া লাগেনি, নতুন চশমা সুবোধের চোখে। ভুরুর ওপরে ছোট একটু ব্যাণ্ডেজ।

উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে হনহন রাগে কুঞ্জ চলতে শুরু করল।

সব শুনে শশী বলল, রাগের কী আছে। বকুল ঠিকই করেছে কুঞ্জ।

শশীর সব ঠাণ্ডামাথা বিবেচনা। বলল, স্বামীর ইচ্ছেই তো ইস্ত্রীর ইচ্ছে। স্বামীর ভালই তো ইস্ত্রীর ভালো। তার আবার আলাদা সুখ কী, আলাদা ইজ্জৎ কী।

কুঞ্জ তবু বলল, তাই বলে পরপুরুষের—

শশী বলল, পরপুরুষ আবার কী। স্বামী যার হাতে সঁপে দেন তার মধ্যেই তো স্বামীকে ধ্যান করতে হয়। গোপিনীরা যেমন করেছেন। নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে সঁপে দিতেন, পড়িসনি? এর মধ্যে কোন পাপ নেই কুঞ্জ। বকুলের কোন দোষ নেই।

দোষ তো নেই, কিন্তু মন বোঝে কই। মাঝে মাঝে বকুলের কাছে যায় বটে, কিন্তু গলির কাছাকাছি এসে নাকে হাত দেয়। এখানে কি সে কখনও ছিল!

এখন মনে হয় দুঃস্বপ্নের মত। আঢাকা নর্দমার গন্ধ, ফুটো চালে উঁকি দেওয়া শতনেত্র ইন্দ্র আকাশ, আর শত ছিদ্র কাপড়ে রোগারোগা কতগুলো মেয়েমানুষের ঘোরাঘুরি।

ওখানে শুধু ফুলে ফুলে রামধনু, সবুজ ঘাসগালিচা, ঝাউউদাস হাওয়া, আর, আর মেমসাহেব।

একটি স্বপ্নসুড়ঙ্গের মত সম্মোহিত দিন-রাত্রি।

কোথায় কোন্ স্পোর্টসে বখশিস বিতরণ করে এসেছেন মেমসাহেব। এসেই শুয়ে পড়েছেন বিছানায়। মাথা ধরেছে। একটু ওডিকোলন ছিটিয়ে দিলেন কপালে, তাতেও ব্যাথা কমল না, অস্ফুট গোঙানি শুনতে থাকল কুঞ্জ, দূরে বসে। একটু পরে মেমসাহেব ওকে ইসারায় ডাকলেন, ছোট রুমালটা শুকিয়ে গিয়েছিল, আবার ভিজিয়ে আনতে বললেন।

শয়নকক্ষলগ্ন স্নানঘর। এটুকু পথ যেতে আসতে কুঞ্জর তিন মিনিট কেটে গেল। এতক্ষণ ধরে নিবিড় স্পর্শে ইন্দ্রাণীর কপালের সবটুকু তাপ আহরণ করেছে রুমালটা, সেই তাপটুকু কুঞ্জ শুষে নিতে চাইছে করপৃষ্ঠের রোমকূপ দিয়ে। বেসিনে জল ঝরছে, ঝরছে ত ঝরছেই; ইন্দ্রাণী কাতর গলায় ডাকলেন, কুঞ্জ! কী করছিস এতক্ষণ ধরে।

চকিতে সম্বিত ফিরে এল। থরথর হাতে ভিজে রুমালটা মেম-সাহেবের হাতে কুঞ্জ তুলে দিল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকেছেন চৌধুরী সাহেব। সুইচবোর্ডে হাত দিতেই ইন্দ্রাণী বলেছেন, প্লীজ, ডোণ্ট।

মাথা ধরেছে?

পাশ ফিরে শুয়ে ইন্দ্রাণী বলেছেন, ইয়েস, বীষ্ট্‌লি।

তখনকার মত কেটে গেছে বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নমোহ বারবার ফিরে এসেছে কুঞ্জর।

আর্ট একজিবিসনে যাবেন, বিছানা থেকে উঠে মেমসাহেব চোখে জল দিতে গেছেন, বিছানাটা ফের ঠিক করতে গিয়েও কুঞ্জর হাত সরেনি। চাদরে বালিশে একটি দিব্যদেহের ছাঁচ, একটি অস্পষ্ট মধুর সুরভি।

জুতো পালিশ করতে গিয়েও দেরি হয়েছে, ধমক খেয়েছে, তবে কুঞ্জর হুঁশ হয়েছে।

আরেক দিন।

দামী শাড়িখানা কুঞ্জই ধুতে দিয়েছিল। ভাঁজ খুলেই মেমসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, একী, এমন করে আঁচলটা কাটলে কে।

তলব পড়ল কুঞ্জর।

—এটা কে ধুতে দিয়েছিল, তুমি?

কুঞ্জ স্বীকার করল। তৎক্ষণাৎ ওকে শাড়িটা দিয়ে ইন্দ্রাণী বললেন,—যাও, এক্ষুনি এটা ওদের দোকানে দেখিয়ে নিয়ে এস। বল পুরো দাম কাটব আমি।

কুঞ্জ তবু নড়ে না।

মেমসাহেব ধমক দিলেন আবার—যা—আও! দাঁড়িয়ে আছ যে।

পলক পড়ছে না কুঞ্জর চোখের। ওর পেছনের দেয়ালে বিজলী আলো, সামনে মেমসাহেব। হঠাৎ কুঞ্জর নজরে পড়েছে, মেম সাহেবের গায়ে ওর সম্পূর্ণ দেহের ছায়া। কুঞ্জর চিনতে ভুল হয় নি, সে-ছায়া ওর নিজেরই। নিনখ শুভ্র পায়ের আঙুর আঙুল ছুঁয়ে সাপের মত বেয়ে বেয়ে উঠেছে সে ছায়া, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে বাধা পেয়ে পেয়ে, বাধা না মেনে, ছায়া করাঙ্গুলি থরথর করে কাঁপছে ইন্দ্রাণীর দুঃশাসন উচ্চচূড় স্তনে, কুঞ্জর রুগ্ন, ধুক ধুক বুক ছায়া হয়ে মিশে আছে ইন্দ্রাণীর অবারিত গ্রীবামূলে, আর ইন্দ্রাণীর ঈষদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠ কুঞ্জর ছায়া-কণ্ঠে আসক্ত। মাথায় কুঞ্জ ইন্দ্রাণীর চেয়ে ছোট, কিন্তু ছায়া হয়ে ছাড়িয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী ফের অসহিষ্ণু ধমক দিলেন, কই গেলে না? যাও।

যাবে, কুঞ্জ এবার যাবে। কায়া দিয়ে যার পায়ের পাতাটুকু ছোঁবারও

অধিকার কোন দিন পাবে না, ছায়া হয়ে তার সর্ব দেহের নিবিড় স্পর্শ পেয়েছে। কুঞ্জর আর আফ্‌শোস নেই।

কিন্তু কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। ক'দিন ধরে স্পষ্ট টের পেয়েছে কুঞ্জ।

বাগানে জল দেওয়া বন্ধ। ঘাস বিবর্ণ, হ'লিহক, ভায়োলেট, পপি আর প্রিমরোজ নির্জীব। গাছগুলো ঝাঁকরাচুল হল, তবু ছাঁট নেই। শশী বলল, এ বছর আর ফুল হবে না, বাড়তি খরচ সাহেব সব বন্ধ করে দিয়েছেন। একটু থেমে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে আবার বলল, আমারও জবাব হয়ে যাবে কুঞ্জ।

—জবাব হয়ে যাবে শশীদা।

কুঞ্জর শহর বাস বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, গলায় আর তেমন আন্তরিকতা ফোটে না। এমন কি শশীর সুপারিশেই যে এখানে ঢুকেছিল সেটাও যেন ভাল মনে নেই কুঞ্জর।—জবাব হয়ে যাবে শশীদা! কারুর পুত্র বিয়োগের খবর পেয়ে মেমসাহেব ফোন তুলে যে সুরে শোকাতুরাকে সান্ত্বনা দেন, কুঞ্জর গলাতেও সেই নিরুত্তাপ নাগরিকতা।

আসল খবর জানা গেল ক্রমে ক্রমে। শেয়ারের খেলায় ফকির হয়েছেন চৌধুরী সাহেব। কাঁচা টাকা প্রায় সবই খাঁচাছাড়া চিড়িয়ার মত উধাও, স্থায়ী জিনিসের মধ্যে এই বাড়ি, এই গাড়ি আর কিছু জমি —সেখানেও স্পেকুলেশন—সেও বঁড়শে-বেহালার দক্ষিণে, নীচুডাঙ্গায়, ভূমণ্ডলের মত তারও তিনভাগ জল একভাগ স্থল।

ভেজান দরজার বাইরে কুকুরটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে, কেউ ফিরেও চায়না, দরজার আড়ালে সাহেব-মেমের কলহ চলে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোয় কুঞ্জ, কী কথা হয় বোঝে না, শুধু চাপা গলার ক্রুদ্ধ গর্জন কানে আসে।

মাঝে মাঝে কুঞ্জ চমকে ওঠে, এই এক্ষুণি পর্দা ঠেলে মেমসাহেব বেরিয়ে আসবেন, একটি মাত্র আঙুলের ইশারায় ওর জবাব হয়ে যাবে। যে পথে গেছে বাগানের ফুল, লনের ঘাস, দেয়ালের কলি, সেই পথেই কুঞ্জকে যেতে হবে।

শক্ত করে টুলটা চেপে ধরে কুঞ্জ, চোখের পাতা ভিজে ওঠে। যাবে না, যেতে পারবে না। কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে কুর্তার পকেটটা হাতড়ায়, মুঠি করে ধরে। কে জানে কুঞ্জ ওখানে কী রেখেছে।

পা টিপে টিপে দরজায় চোখ রাখে। সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন টুলের ওপর পা রেখে, একটা হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে, স্পষ্টই উত্তেজিত।

—দেখাবে না, দেখাবে না তুমি আমাকে তোমার হিসাব?

—না। সংসার খরচের টাকায় তোমাকে হাত দিতে দেব না; এটা আমার।

—তোমার! এমন স্বরে সাহেব হেসে উঠলেন যে কুঞ্জর মনে হল জানালার সার্সি ঝন ঝন করে উঠল।—তোমার! তোমাকে কে চেনে ইন্দু, সবাই চেনে মিসেস চৌধুরীকে। এর কোন জিনিসটা তোমার। সংসার খরচের টাকার কথা ছেড়ে দাও, এই মুহূর্তে তোমার বাক্সের চাবি ছিনিয়ে নিতে পারি, দেখতে পারি কত আছে তোমার পাশ বইয়ে, এমন কি, এক টানে ছিঁড়ে নিতে পারি তোমার কানের ওই বার্লিংটনের বাড়ির জড়োয়া দুল—

কুঞ্জ শিউরে উঠল, দেয়ালটা ধরে সামলে নিল, সরল না তবু। সভ্য মানুষটির মুখোশ বুঝি একেবারে খসে-খসে।

কিন্তু,না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ইন্দ্রাণী, দেবী প্রতিমার মত, সাহেবের মাথাও যেন ছাড়িয়ে গেছেন। দেবীর মত অস্ত্র-শস্ত্র নেই হাতে, কিন্তু ভঙ্গিটা এক। তা ছাড়া ওই দ্রুত ওঠাপড়া বুকের সাহস, প্রোজ্জ্বল চোখের ঘৃণা, ওই তো তাঁর আয়ুধ।

একটি কঠিন আঙুল তুললেন ইন্দ্রাণী, একটি নিশিত ছুরিকার মত, রঞ্জিত নখাগ্রে বিজলী ঝলসে গেল—যাও, এক্ষুণি চলে যাও তুমি। যাও।

সেই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর পায়ের কাছে কুঞ্জ মূর্ছিত হয়ে পড়তে পারত। পেরেছেন, ইন্দ্রাণী পেরেছেন। তার কুড়িবুড়ি বকুলদি যা পারেনি, একটি মাত্র নির্ভীক আঙুল তুলেই মেমসাহেব সেই অসাধ্য সাধন করেছেন।

সাহেব বেরিয়ে যেতেই মেমসাহেব শুয়ে পড়লেন, আলো নিবিয়ে।

পা টিপে টিপে সেই ঘরে ঢুকল কুঞ্জ। কী ঠেকল পায়ে। একটা কাঁটা। বোধহয় মেমসাহেবের চুলের।

সেই যে বেরিয়ে গেলেন সাহেব, আর সাত দিনের মধ্যে ঘরমুখো হলেন না। বাগান তো কবেই শুকিয়েছিল, এখন ধুলোর সর পড়েছে বারান্দায়, পর্দায়, আসবাবে। মেমসাহেবের ভ্রূক্ষেপ নেই! ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে, এসেছে একটু কঠিন দৃঢ়তা। পোষাকের সেই ঝিমঝিম এসেন্সগন্ধটুকু নেই, এ ক'দিন মেমসাহেব মোটে প্রসাধনই করেন নি। কাছেও ডাকেন নি কুঞ্জকে। তবু, দূর থেকে দেখেই, কুঞ্জর বুক ভরে গেছে। ইন্দ্রাণী বিদ্রোহী,—বন্দিনী, তবু বিজয়িনী।

সাতদিন পরে ফের ঘরের মধ্যে গুন গুন আলাপ শুনে কুঞ্জর অবাক লাগল। শশী বলল, সাহেব কাল ফিরেছেন যে। অনেক রাত্তিরে গাড়ি এল, শুনিসনি? সাহেব গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ে।

—কেন?—অর্থ নেই, তবু কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করল।

পুরানো চাকর, কী করে সব খবরই যেন চটপট জানা হয়ে যায় শশীর। একটা ফিলিম কোম্পানী খোলার ইচ্ছে সাহেবের অনেক দিনের। এবার শেয়ার বাজারে মার খেয়ে সেই ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়েছে। যা কিছু ঝরতি-পড়তি পুঁজিপাটা আছে, সব একত্র করেছেন। বোম্বাই থেকে পাকড়ে এনেছেন জন কয়েক চাঁইকে। বেশির ভাগ টাকা তারাই দেবে, বাংলা বই কলকাতাতে তোলা হবে।

—তারা সব কোথায়? কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করল।

তারা উঠেছে একটা বড় হোটেলে, আজ বিকেলে জোর একটা পার্টি।

সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। শিস্ দিলেন খানিকক্ষণ, নীল আকাশটার দিকে চেয়ে। লুপিকে কোলে তুলে আদর করলেন।

মেমসাহেবও এসেছেন পিছনে পিছনে। চৌধুরী বললেন, আমি তা হলে এখন চললুম। ছ'টার আগেই ওদের নিয়ে আসবে। তুমি সব ব্যবস্থা এদিকে ঠিক করে রেখ, হোটেলে ফোন করলেই ওরা সব ঠিক-ঠিক পৌঁছে দিয়ে যাবে।

—পারব না।

সাহেব চটলেন না, হাসলেন,—নটি গ্যাল ; সেম এ্যাজ এভার।

—বিকেলে আমার কাজ আছে; আর্টগ্যালারিতে সিম্পোসিয়ম।

—টু হেল উইথ ইয়োর সিম্পোসিয়ম। সাহেব বললেন,—না না, এ কাজটা তোমাকে করতেই হবে ইন্দু ; এটা হাসিল হলে আমার ভাল, তোমার ভাল। ইউ ক্যান ডু ইট, এ্যাণ্ড আই নো ইউ উইল।

মেমসাহেব জবাব দিলেন না, ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন। উঁকি দিয়ে কুঞ্জ দেখেছে, সোফায় ইন্দ্রাণী আধশোয়া হয়ে। করপল্লবে দু'চোখ আচ্ছাদিত। অনেক পরে মেমসাহেব উঠলেন, চাবি দিয়ে খুললেন আলমারি। কুঞ্জ তখনো দেখছে। থরে থরে সাজানো শাড়ি, জামা, পেটিকোট। ভাঁজ খুলে খুলে মেমসাহেব দেখছেন।

নিঃশ্বাস পড়ে না কুঞ্জর। সাহেব নেই, এই অবসরে তবে পালিয়ে যাবেন মেম সাহেব! বেছে নিচ্ছেন শুধু নিজের পছন্দমত দু'চারখানা জামা কাপড়।

কিন্তু না। মেমসাহেব সবই ফের একে একে গুছিয়ে রাখলেন আলমারিতে। শুধু চোখ ঝলসানো এক প্রস্থ পোষাক নিয়ে গোসল কামরায় ঢুকলেন।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন নব রূপে ; আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরলেন কর্ণাভরণ, যাতে তাঁকে সব চেয়ে মানায়।

কুঞ্জর তলব পড়ল খানিকক্ষণ বাদে। আজ ক'জন লোক আসবে, মেমসাহেব বললেন, তুমি দরজা জানালাগুলো একটু ঝেড়ে পুঁছে রাখ।

বেলা পড়তে না পড়তেই হোটেলের গাড়িতে খাবার এল। নার্সারির লোক পৌঁছে দিয়ে গেল গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত পদ্ম। ধবধবে ঢাকনা পড়ল ছোট ছোট টেবিলে ; ঝকঝকে চিনে-মাটির বাসন বেরুল অনেকদিন পরে।

তারপর, বেলা গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গনে ঘস ঘস শব্দ শোনা গেল কয়েকটা গাড়ির; সিঁড়িতে এক সঙ্গে অনেকগুলো ঠকঠক জুতো।

কুঞ্জ চেয়ে দেখল, সব সিল্ক পাৎলুন আর হাওয়াই কুর্তার দল।

সবায় সঙ্গে আলাপ করছেন মেমসাহেব, হেসে হেসে করমর্দন করছেন।

ওদের জন্যেই মেমসাহেব পিয়ানোতে একটা গৎ বাজালেন; তারপর, চৌধুরী সাহেবের ইশারায় বেছে বেছে খেতে বসলেন এমন একটা লোকের পাশে, যার ভুঁড়ি ঠেকেছে প্লেটের কিনারে, রোমশ একটি হাতের চার আঙুলে চারটি আংটির ঝিকিমিকি।

কয়েকটা খাবার নিজের পাতে নিল লোকটা; কটা দিল মেমসাহেবের ডিশে। হাতে হাতে ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল, মেমসাহেব হাত সরালেন না, সরেও বসলেন না পর্যন্ত। কুঞ্জর তখন চোখ দুটি জলছে।

তারপর কী একটা রসিকতা করল লোকটা, সবাই হেসে উঠল, চৌধুরী সাহেবও যোগ দিলেন। মেমসাহেব লাল হলেন, কিন্তু মুহূর্তমাত্র, যেন রাগ করলেন, তারপর নিজেও সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

চৌধুরী বললেন, এসব বলে ইন্দুকে তুমি লজ্জা দিতে পারবে না ছবিলাল। ও 'প্রুফ' হয়ে গেছে কবে। স্টেজ-শাই নয়। এম্পায়ারে নেচেছেও তো কয়েকবার।

রিয়েলি! ছবিলাল বলল,—আসুন না মিসেস চৌধুরী, এই ছবিতেই নেমে পড়ুন তবে।

মেমসাহেব বললেন, আই ওন্ট মাইণ্ড ইফ আই ডু—হেসে উঠলেন খিল খিল করে। কুঞ্জ কথাটা বুঝল না—হাসিটা বুঝল।

তারপর কুঞ্জ সরে এসেছে বাগানের এক কোণে। শরীরের সব কটা রগ যেন শলতে হয়ে জলছে।

ওর কুর্তার পকেটে হাত দিতেই সযত্নে রাখা ক'টা জিনিস বেরুল, কুঞ্জ একটার পর একটা ছুঁড়ে ফেলে দিল—যত দূরে পারে।

শাড়ির আঁচলের কটা টুকরো, চুলের কাঁটা, চিরুণী থেকে ফেলে দেওয়া কয়েক গাছি দীর্ঘ চুল, কয়েকটি রঞ্জিত নখাগ্র।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে কুঞ্জ। ওর এতদিনের গোপন সংগ্রহ, এতদিনের চুরি, পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে দিতে দিতে অস্ফুট ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, বাঁদি—সব বাঁদি।

যাদুঘর

ছয় ঋতুর মধ্যে টুরিস্ট হামলা শুরু হয় ঠিক এই সময়ে, পড়-পড় শীতে। ইস্টিশনটা এমনিতে হট্টমন্দির, যেমন খুশি, যখন খুশি আসা-যাওয়া, কিন্তু এখন বড় কড়াকড়ি! দরোজাদারবাবু সিগন্যাল হেঁট হ'তে না হ'তেই এসে হাজির: চিচিং বাঁধ। বিনটিকিট মাছিটাকেও গলতে দেবেন না।

সাইকেল-রিক্সাঅলার দল ঘন ঘন ট্রিং-ট্রিং ট্রিপ মারছে। একজোড়া মোটে তেরপল-ঘোমটা ট্যাক্সি, পাম্প থেকে ফাঁকে ফাঁকে চোঁ-চুমুক পেট্রল টেনেই স্টেশনে ছুট।

হোটেলে হোটেলে জোড়াকবাট মানা। রিসেপশনিস্ট প্লাকার্ড উল্টে ব'সে আছে: সিঙগল সীটেড? ও ক্রাইস্ট, নো। ডবল? ই-ইয়েস, অন গ্রাউণ্ড ফ্লোর।

এগুলো কুলীন, কলকাতা থেকে বন্দোবস্ত করে তবে আসতে হয়। তবে থানা-আস্তানা মেলে এমন জায়গা আছে আরও দু'একটা, এখনও সীট মিলতে পারে।

টিপটা দিলে ব্রাইটন হোটেলের পোর্টার। অন্নপূর্ণা আশ্রমে যান বাবু; বাঙালীর হোটেল। আপনার সুবিধে হবে।

খবর মিলল তো ঠিকানা মেলে না। গলদঘর্ম হ'তে হ'তে, রিক্সাঅলাকে উপরি বখশিশ কবুল করে, অনন্ত যখন অন্নপূর্ণা আশ্রমের দরজায় টোকা দিলে, তখন ছোট্ট হেমন্তদিন প্রায় শেষ।

পাকা বাড়ি, কিন্তু পুরনো, মুখের চুন ধুয়ে এখন কালি পড়েছে। ফ্রেমে আঁটা টিনের চাকতিটার লেখা অস্পষ্ট, লুপ্তাবশেষ কতকগুলো অক্ষর দেখেই ঠাহর করতে হল, এই হবে।

দরজায় টোকা দেবার পর দু-মিনিটও বোধ হয় দাঁড়াতে হয়নি,

কিন্তু অনন্তর মনে হয়েছিল ঢের বেশি। কবাট আল্‌গা হল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যর্থনা শোনা গেল, 'আসুন।'

স্ত্রীকণ্ঠ। পায়ে পায়ে অনুসরণ করে, একটা উঠোন পার হ'য়ে অনন্ত যে ঘরে পৌঁছল, সেটা পরিসরে বেশি না। রিক্সাওলাকে ভাড়া চুকিয়ে, মোট রেখে, তবে স্ত্রীলোকটির দিকে ভাল করে তাকাবার ফুরসৎ হ'ল।

—আমি এখানে কিছুদিন থাকব ব'লে এসেছি।

—বেশ ত।

অন্ধকারে গলা শুনে যা মনে হয়েছিল, অনন্ত দেখল, স্ত্রীলোকটির বয়স তার চেয়ে কিছু বেশি। ঠিক কত, অনুমান করতে পারল না ফোতো বাবুদের ব্যাঙ্কব্যালান্সের মত ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে মেয়েদের বয়সটা অনিশ্চিত, আন্দাজ করা মুশকিল। রূপ তখন আর উচ্ছল, তটিনী-নটিনী নয়, টলটল দীঘি।

রূপ হয়ত এ মেয়েটির ছিল, এখনও একটু আছে। রাত পুইয়ে যাবার পরও পাতায় পাতায় কুয়াশা লেগে থাকার মত। এখন ভ্রূযুগে একটু ভঙ্গিমার অবশেষ, চিবুকের গঠনে ব্যঞ্জনার লেশ।

চোখ নামিয়ে নিলে অনন্ত, ব্যাগ বার করে বললে—কত দিতে হবে।

হঠাৎ যেন লাল হল মেয়েটি। এক নিঃশ্বাসে বললে,—'আমাকে না, আমাকে না।—অনন্তকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ না দিয়েই ত্রস্ত পায়ে অন্তর্হিত হল।

বিছানা খুলতে খুলতে অনন্ত ঘরটার চারধারে নজর বুলিয়ে নিলে। আসবাব বলতে কিছু নেই; একটা ঢিলেদড়ি চারপাই, ছোট একটা টুল, দেয়ালে একটা তাক। ওখানে দাড়িকামানর সরঞ্জাম আর খান দুই বই, যা সঙ্গে এনেছে, ঠাসাঠাসি রাখা যাবে।

—আপনি?

চমকে অনন্ত পিছনে তাকাল। রোগা, মাঝবয়সী একটা লোক, ঘরের ঠিক মাঝখানটাতে এসে দাঁড়িয়েছে।—ও, গেস্ট? বসুন, বসুন।

বিকেলের গাড়িতে এলেন বুঝি। দুপুরের? তবে এতক্ষণ—ও, বুঝেছি মশাই, অন্য কোথাও ঠাঁই মেলেনি, তাই জগদিন্দু গাঙ্গুলীর হোটেলেই—

যত প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক, তত জবাব চান না; কতকটা সেকালের রথীদের মত, নিজের বাণ নিজেই সম্বরণ করেন।—কতদিন থাকা হবে, মাস তিনেক? রেট? আমাদের রেট মশাই দিন তিন টাকা আট আনা, এখনো সেই সত্যযুগেই আছি। তা আপনি তো পার্লামেন্ট মেম্বরের রিবেট পাবেন, নীট পঁচানব্বুই, পনেরো দিনেরটা এ্যাডভান্স, হল গিয়ে সাড়ে সাত চল্লিশ, তা মেথরখর্চা, কেরোসিন তেল বাবদ পুরো পঞ্চাশ টাকাই দেবেন।

পাঁচখানা নোট ট্যাঁকে গুঁজলেন, কষির দাগ দেখা গেল, শাদা লাল শাদা লাল ঘায়ের মত।—তা মহাশয়ের এখানে আসার উদ্দেশ্য?

অনন্ত সংক্ষেপে বললে,—চেঞ্জ। পুজোর আগে নিউমোনিয়ায় ভুগেছিলুম।

—বেশ, বেশ। গলা নামিয়ে জগদিন্দু বললেন,—অবিশ্যি স্বদেশী লোক হ'লেও আমার আপত্তি নেই। আমার এখানে, মশাই, নাম ভাঁড়িয়ে সেদিনও এক ফেরারী আসামী কাটিয়ে গেল। ধরিয়ে দিইচি? কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। সদর রাস্তার ওপরে হোটেল না হওয়ার ওই সুবিধে, একেবারে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। সেদিনও বাপ মায় মত না নিয়ে বিয়ে করার মতলবে একজোড়া এসেছিল।

চোখ মিট মিট করে গাঙুলী মশাই বললেন,—এসব ব্যাপারে বেশি প্রশ্রয় দিইনে মশাই, তবু—বয়সধর্ম জানি ত—যে সাতদিন ওরা ছিল, এক ঘরে শুতে দিইচি। ওরা ধরা পড়ল, তাও এখানে নয়, ইস্টিশানে গিয়ে।

অনন্ত বললে,—ও।

—ছেলেটাকে পুলিশ কী মারটাই মারলে, মশাই! মেয়েটাকে অবিশ্যি কিছু বললে না। ওর বাপটাও পুলিশের সঙ্গে এসেছিল কিনা। ওকে বোধ হয় মায়লে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে।

অনন্তর বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই দেখে গাঙ্গুলী প্রসঙ্গ বদল করলেন। —তা বেশ, এসেছেন, থাকুন। এখানে খাবেন ভাল, থাকবেন ভাল। ভীড়ের ঝামেলা নেই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তাই টের পাচ্ছেন না, নইলে আলোও যথেষ্ট আছে। জানালার বাইরেই নিমগাছ। হাওয়াও একটু পাবেন। বেশি হাওয়ায় কাজ কী মশাই, আপনি এই নিমুনিয়া থেকে উঠেছেন, বুকে ঠাণ্ডা লাগবে।

তা লাগুক, অনন্তর এখন একটু আলো চাই। অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে ঘরের ভেতর,—দু' একটা মশাও বুঝি পায়ে কামড়ালে, দরজার ওপরে ঝটপট করছে, কে জানে, বোধ হয় কানা চামচিকে।

ইঙ্গিত বুঝে গাঙুলী হাঁক দিলেন, কইহে, একটা আলো দিয়ে যাও।

একটু পরেই লণ্ঠন নিয়ে এসে দাঁড়াল, সেই মেয়েটি। ফিতেদপ্‌দপ চিমনিটা ভাঙা, মাথায় কালি। তবু, অন্ধকার তাতেই কেটে গেল। এরই মধ্যে মেয়েটি বুঝি সামান্য সাজবদল করে এসেছে, চুলটাও বেঁধে থাকবে। তাতে রূপ বাড়েনি, বয়স একটু বা কমেছে। লণ্ঠনটা নামিয়ে মেয়েটি আর দাঁড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। অনন্ত লক্ষ্য করলে, সেই কেমন বিব্রত, কুণ্ঠিত ভাব।

জগদিন্দু গাঙুলীর নামটা স্বমুখেই জেনেছিল, অনন্ত এবার জিজ্ঞাসা করলে,—এঁর নামেই হোটেল বুঝি।

—অন্নপূর্ণা আশ্রমের কথা বলছেন? ওর নামে হতে যাবে কেন। মায়ের নামে।

'আপনার মা?'

খদ্দেরের কাছে যতটা যায়, ততটাই বিরক্তি প্রকাশ করে জগদিন্দু বললে,—আপনি নাস্তিক নাকি মশাই। আমার মা হবে কেন। বিশ্ব-জননী, যিনি সকলকে অন্ন যোগাচ্ছেন। বারানসীর অন্নপূর্ণা, শোনেননি? ইনি সেই।—দু' হাত এক করে মাথায় ঠেকালে জগদিন্দু, গলা ঈষৎ নামিয়ে বললে,—তা ছাড়া, আপনি যা মনে করেছেন, ও তা নয়। হল, এই, ইয়ে, মানে ঝি ক্লাশের।

সারা রাত নিমগাছের ডালে সর্ সর্ ডানা ঝাপ্‌টানি ; জানালার আল্‌গা পাল্লায় ঠক ঠক শব্দ। শ্রান্ত শরীর, তবু ভাল ঘুম হল না। একবার মনে হল, কোথায় যেন ফিস ফিস শুনছে। উঠে গেল, দরজায় রাখল কান। কিচ্ছু না। ফিরে এল বিছানায়। চোখ বুজে তবু দেখা বন্ধ করা যায় ; কানের যদি একটা পাতা থাকত!

শ্রান্ত স্নায়ুর সুতো ক'টিকে একাগ্র করে যতবার ঘুমের সূচে পরাতে গেল, ততবার পিছলে গেল। জানালা খুলে দিল সাহস করে।

হু হু হিম হাওয়ায় ঘর ভরে গেল, যাক, বন্ধদম অস্বস্তির চেয়ে এ বরং ভাল। এতক্ষণ অনন্ত টের পায়নি চাঁদ উঠেছে, আকাশের রঙ দুধকুয়াশা। আবার শুয়ে পড়ল যখন, বালিশের নীচে রাখা হাতঘড়িতে সময় দেড়টা। একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, হঠাৎ ভেঙে গেল। কে কাঁদছে। মেয়েলি গলা, ফোঁপানি-গোঙানি মিশিয়ে কেমন একটু বিকৃত। কিন্তু খুব কাছেই ; হয়ত দরজা খুলেই অনন্ত দেখতে পাবে একটি বিকীর্ণকবরী, অবিন্যস্তবেশ নারীদেহ চৌকাঠের ওপর উপুড় হয়ে আছে। লোভ গেল, তবু অনন্ত দরজা খুলল না ; খুললেই ভেঙে যাবে এই স্বপ্নমায়ামতিভ্রম ; হয়ত অশ্রুরক্ত দু'টি চোখ তুলে যে তাকাবে, সে যৌবনোত্তীর্ণা। জগদিন্দু গাঙুলীর ভাষায় ঝি-ক্লাশের।

একেবারে শেষ রাতের ঘুম, ভাঙল দেরিতে। দরজা খুলে অনন্ত যখন বারান্দায় এল, তখন রকে রোদ এসে গেছে। একটা চটের বস্তা হাতে জগদিন্দু কোথায় বেরুচ্ছিলেন।—এই উঠলেন ? খুব হ'লে গাঢ় ঘুম হয়েছিল বলুন। বলেছি না, অন্নপূর্ণা আশ্রমে কোন অসুবিধে নেই, খালি খাবেন, ঘুমোবেন।

চটের থলেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অনন্ত বললে,—এটা ?

—বেড়াল। পার করতে যাচ্ছি। কাল সারারাত বাইরে কেঁদেছে। বেড়ালের কান্না বড় অমঙ্গল।

গাঙুলী বেরিয়ে যেতেই কী মনে হল অনন্তর, হাঁটু ভেঙে বসল

মাটিতে। সন্দেহ নেই, ওর চোখে ধূলো দিতে সাজানো একটা কথা বলে গেছে গাঙুলী। এই চালাকিটা ধরে ফেলতে হবে। ভিজে শানে দু' এক গাছি দীর্ঘ চুল এখনও চৌকাটের কাছে লেগে আছে, অনন্তর বিশ্বাস।

কিছু পাওয়া গেল না। আজ খুব ভোরেই কে যেন সন্তর্পণ হাতে কালকের অশ্রুপাতের চিহ্নটুকু মুছে নিয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনন্ত উঠে দাঁড়াল।

—চা আনব?—প্রশ্নটা এল দরজার বাইরে থেকে, ভঙ্গি তেমনি কুণ্ঠিত।

—আন।—কালকে আপনি বলেছে, আজকের হঠাৎ 'তুমি'টা নিজের কানেই একটু শ্রুতিকটু শোনাল।

শোনাক। ইচ্ছে করেই একটু রূঢ় হল অনন্ত। অকুলজা, হয়ত কুলটা, একটি অন্তরূপা রমণীকে সম্মান দেখিয়ে যে ভুল করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত ওর ভদ্র মনের শান্তি নেই।

তাই একটু পরেই চায়ের কাপটাও ঠেলে দিল অনন্ত। প্রায় চেঁচিয়ে বললে,—এত কম চিনি দিয়েছ কেন, এটা কি চা হয়েছে?

বলেই বুঝল, বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কমচিনি চায়ে কি জিভ এতটা তেতো হয়, হতে পারে? নাকি, কাল ঘুম হয়নি, সেই অবসাদটুকু বিষ হয়ে জড়ো হয়েছে চিত্তে—অনন্ত আর মাত্রা ঠিক রেখে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে না।

মাথা নিচু করে মেয়েটি চায়ে চিনি মেশাচ্ছে; সেই অবসরে অনন্ত ওকে খুঁটিয়ে দেখল। ঝি ক্লাশের বলে জগদিন্দু কী বোঝাতে চেয়েছে সে-ই জানে, অনন্তর মন কিন্তু এই বর্ণনায় সায় দিলে না। একটু আগেই আঘাত করেছিল; আবার এখন, এই পরমুহূর্তেই, শান্ত, ত্রস্ত, বিব্রত এই মেয়েটির প্রতি করুণাপ্লুত হয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অনন্ত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার নাম কী।

পশুপতি মজুমদার নিজেই আলাপ করে গেলেন।

ফিতে বাঁধা জুতো, ধুতির ওপর গলাবন্ধ কোট, চেনঘড়ি। ব্যাকরণ মিলিয়ে বাবু।—চেঞ্জার? কাল এসেছেন? নমস্কার মশাই। আমি এখানকার একজন বোর্ডার। বেশ, ভাল, এখন আফিসে যাচ্ছি, বিকেলে আলাপ হবে। বেড়িয়ে আসা যাবে পাহাড় পর্যন্ত।

একটু পরেই এসে তাড়া দিলেন জগদিন্দু।—স্নান সেরে নিন।

অনন্ত সবে একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছিল, বলল,—এখন না। একটু পরে।

—দেরিতে খাওয়া অভ্যেস? তা বেশ। আমি তা হলে খেয়ে নিই মশাই? দোষ নেবেন না। আমার আবার অফিসের বেলা হল।

আস্তে আস্তে কেমন নিঝুম হয়ে গেল বাড়িটা। একটি মানুষের পায়ে চলার শব্দটুকু নেই। দরজা ভেজান, জানালা বন্ধ, ঘর কেমন ছায়াছায়া স্তিমিত। গোটা কয়েক চড়ুই পাখী এতক্ষণ মেজেতে চাল খুঁটছিল, তারাও কখন দেয়ালের ফোকরে আশ্রয় নিয়েছে।

ভেজান দরজা একটু আল্‌গা হল, কবাটে কব্‌জায় আওয়াজ হল, অনন্ত মাথা না ফিরিয়েই বুঝতে পেরেছিল।

—স্নান করুন।

মুখ ফেরাতেই চোখে চোখ পড়ে গেল। অনন্ত বললে,—এস সুরমা।

সঙ্গে সঙ্গে সুরমা দু' পা পিছিয়ে গেল। সেই সঙ্কোচ, নিষ্প্রভজ্যোতি চোখে আতঙ্ক। তীব্র দ্রুতস্বরে বলে উঠল,—না, না, না। ভেতরে না—আর, অনন্তকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই অন্তর্হিত হল।

স্নান সেরে ঘরে ফিরে অনন্ত দেখল, টুলের ওপর খাবার ঢাকা আছে। খেতে শুরু করেও বারবার দরজার দিকে তাকাল, হয়ত সুরমা এসে জিজ্ঞাসা করবে আর কিছু চাই কিনা! কিন্তু কেউ এল না। আর কিছু যাতে না লাগে, সুরমা পরিমাণটা সেই রকম হিসাব করেই দিয়েছে। থালাতেই হাত ধুয়ে অনন্ত শুয়ে পড়ল।

ঘুম হল না। নিম গাছের ডালে ক'টা কাক চীৎকার করছে ক্রমাগত, সমুখের রাস্তাটা দিয়ে সময় বুঝে ঠিক এখুনি কতকগুলো বয়েল গাড়ি হাঁকাচ্ছে গাড়োয়ান ; অনন্ত চোখ বুজে পড়ে রইল।

কতক্ষণ ছিল হিসাব নেই, হঠাৎ ঠুন ঠুন শব্দ হতেই চোখ মেলল। চুপি চুপি এসে সুরমা এঁটো বাসন নিয়ে যাচ্ছে।

—এই, শোন।

সুরমার পা দুটি থর থর কাঁপল, কিন্তু পালাল না। ফিরে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বললে,—বলুন।

আদেশ, শাসন, ব্যাকুলতা সব মিশিয়ে অনন্ত ঝোঁকের মাথায় ডেকে বসেছিল। কী বলবে, ঠিক ছিল না। কোন কথা ভেবে রাখেনি। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইল।

সুরমা একটু অপেক্ষা করে আবার বললে,—কী বলবেন, বলুন।

এতক্ষণে অনন্তর বুঝি খেয়াল হয়েছে, কিছুই বলবার নেই ; তাই অনেক ভেবেচিন্তে একটা নিরর্থক, ছেলেমানুষি প্রশ্ন করে বসল, 'এ হোটেলে আর কোন কাজ করবার লোক নেই, না।'

ঘাড় নেড়ে সুরমা জানালে, না।

'হোটেল কত দিনের ?'

'বিশ বছরের।'

কী মতিভ্রম হল অনন্তর, একটা কাণ্ড করে বসল।

খপ করে সুরমার দু'টি হাত ধরে বলল, 'এই বিশ বছর ধরেই তুমি এখানে ঝিগিরি করছ সুরমা ?

ছিটকে সরে গেল সুরমা। 'না, না, না।' ঝন্ ঝন্ শব্দ। একটা কাঁচের ডিশ চুরমার হয়ে গেছে মাটিতে পড়ে, সুরমা তীরের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

না, না, না। কী বলতে চাইল সুরমা ? ও ঝি না, না ওকে ছুঁতে মানা ?

আশ্চর্য, এর পরেও সুরমা ফিরে এল কিন্তু। অনন্ত কম্বলমুড়ি দিয়ে

শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু টের পেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেজে থেকে কাচের টুকরোগুলো সুরমা কুড়িয়ে নিচ্ছে।

স্নায়ুর সব শ্রান্তি ফোঁটা ফোঁটা ঘাম হয়ে ফুটল অনন্তর কপালে। এ কী খেলা, কিছু বোঝা যায় না। কেন পালায় বারবার। পালায় যদি ফিরে ফিরে আসে কেন।

ধড়মড় করে অনন্ত উঠে বসল, দরজা আগলে দাঁড়াল। সুরমার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল—তোমাকে একটা শুধু কথা বলব সুরমা। আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নেই, বিশ্বাস করো। তোমাকে দেখে একটা খটকা লেগেছে, তুমি সেটা শুধু মিটিয়ে দাও।

—বলুন।

অনন্ত বলল,—কিসের এত ভয় তোমার। কাকে। কেন?—মুখ তুলে তাকাল সুরমা। বোধ হয় বিশ্বাস করা যায় কিনা ভাবল। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, 'বলব। আপনাকে সব কথাই বলব। পরে। এখন পথ ছাড়ুন। এগুলো ফেলে দিয়ে আসি।'

পশুপতি মজুমদার বললেন,—বড় সাংঘাতিক মেয়ে এই সুরমা। শতহস্ত দূরে রাখবেন।

চড়াইয়ের পর চড়াই, দু'পাশে গভীর খাদ, পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে উপবীত পথ। অনন্তর অভ্যাস নেই, দেহ দুর্বল, রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। পশুপতি গলা ঢেকেছেন কম্ফর্টারে, কান টুপিতে, কিন্তু পাথরের ধাপগুলো টপকে যাচ্ছেন অনায়াসে।

—আসুন এখানটাতে বসা যাক। এটার নাম প্লেনভিউ পয়েণ্ট।

'সুরমার কথা বলছিলেন।' অনন্ত মনে করিয়ে দিলে।

একটা পাথরের নুড়ি গড়িয়ে দিলেন পশুপতি। 'হ্যাঁ, বড় সাংঘাতিক মেয়ে। জানেন ও একবার জগদিন্দুকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল?'

'মেরে ফেলতে?'

'হ্যাঁ, খাবারে বিষ মিশিয়ে।'

অনন্তর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা শিহরণ বয়ে গেল। একটি নম্র, ত্রস্ত, ভীরু মেয়েকে প্রাণহন্ত্রীরূপে কিছুতেই কল্পনা করতে পারলে না।

পশুপতি ওর মনের কথা আন্দাজ করে নিলেন। 'ভাবছেন, সে কী করে হয়, না? কিন্তু মনে রাখবেন, সুরমার এমন দিন বরাবর ছিল না। ওর রূপ ছিল, তেজ ছিল। মনের জোর ছিল। সেই জোরে একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।'

—কার সঙ্গে?

—জগদিন্দুর।

—আবার তাকেই বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল?

বিজ্ঞের মত হাসলেন পশুপতি। সিগারেটে কড়া টান দিলেন। 'স্ত্রী চরিত্র, মশায়, এমনি। ভালবাসার লোকের জন্যে প্রাণ দিতে পারে; আবার সে ভালবাসা ছুটলে প্রাণ নিতেও পারে।'

—ওদের ভালবাসা ছুটল কেন।

পশুপতি একটু যেন বিরক্ত হলেন। 'এত কথা জানতে হলে তো মশাই অন্তর্যামী হতে হয়। তবে অনুমান করতে পারি। যার জন্যে সব কিছু পরিত্যাগ করে এল, ভাল ঘর, বর, দু'দিন বাদেই হয়ত দেখল, সে মানুষ নয়।

'মানুষ নয়?'

'মানুষ বই কি, পুরুষ মানুষ, অত্যন্ত স্থূল, দৈহিক অর্থে। নইলে জগদিন্দুর আছে কী। না শিক্ষা, না রুচি, না চরিত্র।'

'তবে কী দেখে সুরমা ভুলেছিল।'

পশুপতি বললেন, 'কী দেখে মেয়ে মানুষ ভোলে, তারা নিজেরাও জানে না। হিংস্র হয়ে ওঠে সেই ভুল ভাঙলে। সুরমার তখনকার মনের অবস্থা ভাবুন। নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে পাড়ে উঠেছে, অথচ সামনের পথে কাঁটা। কলসি ঝাঁঝরা হয়ে সব সুধা ঝরে গেছে, যেটুকু লেগে আছে, সেটুকু বাসি, বিষ। সেই বিষই সুরমা জগদিন্দুকে খাওয়াতে গেল। নিজে খেলেই ভাল করত। কিন্তু তাতেও আবার মনের জোর দরকার।'

অল্প অল্প হিম পড়ছে, কনকনে হাওয়া। অনেক নীচে, মসৃণ সমতল পথে সন্ধ্যার বিজলী আলো জ্বলে উঠেছে, অসংখ্য ছোট ছোট জোনাকি-কৌটা; আকাশের নীল আয়নায় তার ছায়া।

পশুপতি বললেন 'কী ভাবছেন।'

অনন্ত উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বিশেষ কিছু না। ভাবছি এর পরেও এরা এক সঙ্গে থাকল কী করে। জগদিন্দু কি জানত, কে বিষ মিশিয়েছিল ওর থালায়।'

'জানত না? যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করেছে, ছটফট করেছে মেজের পরে—সুরমা তখনও সামনে দাঁড়িয়ে; এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেয়নি। তারপর পাড়াপড়শী এল, ডাক্তার এল, জগদিন্দুর শরীর ততক্ষণ নিথর হয়ে এসেছে, কিন্তু চোখ দু'টো তখনও খোলা। যমে মানুষে টানাটানি চলল।'

'সুরমা?'

'তখনো পাথরের পুতুলের মত সামনে দাঁড়িয়ে। কী শীতল, নিশ্চলমণি চোখে যে ওর দিকে তাকিয়েছিল, যদি দেখতেন। ঘৃণার কোন বস্তুরূপ থাকলে দু'জনেই সেদিন অন্ধ হয়ে যেত।'

মাঝে মাঝে পথ ভাঙা; সাবধানে নামতে নামতে অনন্ত বলল, 'এসব কতদিন আগেকার কথা?'

পশুপতি মনে মনে হিসেব করে বললেন, 'তা প্রায় বছর কুড়ি হবে বইকি।' একটু থেমে বললেন 'অবাক লাগছে?'

অনন্ত বলল, 'একটু। সব জেনে শুনেও জগদিন্দু সুরমাকে তাড়িয়ে দিল না? অনায়াসে বিশ বছর ঘর করল?'

পশুপতি হাসলেন। 'জগদিন্দুর চরিত্র তবে আপনি কিছু বোঝেননি।'

বাকিটা পশুপতি ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন।

বিষটা বোধ হয় তেমন মারাত্মক ছিল না, জগদিন্দু সে-যাত্রা বেঁচে গেল। সেরে উঠেই ডেকে পাঠাল সুরমাকে। চোয়াল ব'সে গেছে একদিনের ধকলে, কিন্তু চোখ দুটো ধক ধক জ্বলছে। বলল, 'তৈরি হয়ে নাও সুরমা, তোমাকে যেতে হবে।'

যেতে হবে সুরমাও জানে, কিন্তু কোথায়? কলকাতায়, তোমার স্বামীর কাছে।

সঙ্গে একজন বিশ্বাসী লোক দেবে জগদিন্দু, সে সুরমাকে তার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে আসবে।

সুরমার মুখ পলকে বিবর্ণ হয়ে গেল। এ দু'দিন চোখে জল ছিল না, শুকিয়ে আগুন হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সেই মুহূর্তে কোথা থেকে মেঘ ছেয়ে এল। সুরমা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, জগদিন্দুর পা দু'টির ওপর মুখ রেখে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, 'আমাকে পুলিশে দাও, আর যা খুশী শাস্তি দাও, শুধু কলকাতা পাঠিও না।'

জগদিন্দু টেনে নিল না পা দু'খানা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল। তারপর কঠিন স্বরে বলল, 'বেশ, তোমাকে অন্য শাস্তিই দেব আমি। না না, পুলিশে নয়। তোমাকে ক্ষমা করলাম।'

সেই ক্ষমা যে শাস্তিরই রকমফের, সুরমা তখন যদি জানত। দিন দুই পরে, একটু সুস্থ হ'য়েই, জগদিন্দু বাড়ি থেকে বেরুল। ফিরে এল, কোলে একটা মিউমিউ বেড়ালের বাচ্চা।

সুরমা ভেবেছিল মেঘ কেটে গেছে; ঠাট্টার স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'এ আবার কী।'

জগদিন্দু এখনো গম্ভীর। বললে, 'এমনি।'

রাত্রে খেতে বসে জগদিন্দু ডাকলে, 'পুসি, পুসি, আয়।'

খাটের নীচে না কোথায় ছিল বেড়ালটা, লাফিয়ে এল পাতের কাছে, লুব্ধ কটা চোখে চেয়ে রইল। জগদিন্দু করল কি, এক গ্রাস ভাত মেখে ছড়িয়ে দিল, ওর সামনে। বেড়ালটা চুক চুক চাটতে শুরু করেছে, জগদিন্দু মিটমিট হেসে বললে, 'যাও, মাছ তরকারী আর কী কী আছে নিয়ে এস।'

সুরমার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। রুদ্ধ গলায় বললে, 'এ আবার কী।'

জগদিন্দু বললে, 'এমনি। পরীক্ষাটা ওর ওপর দিয়েই হয়ে যাক।'

এমনি ধারা প্রতিদিন। খেতে বসেই জগদিন্দু ডাকে 'পুসি, পুসি,

আয়।' ভাত মাখে, ছড়ায়। বড় বড় চোখে লক্ষ্য করে, কোন ছটফট অঘটি আছে কিনা। তারপর নেই দেখে, মুখে নিশ্চিন্ত গ্রাস তোলে।

আজ বিশ বছর ধরে এই চলছে। একদিনও জগদিন্দু নিয়ম ভঙ্গ করেনি।

অনন্ত নির্বাক হয়ে শুনছিল। বলল, 'অদ্ভুত প্রতিশোধ তো।'

পশুপতি বললেন, 'অদ্ভুত বৈকি। ভেবে দেখুন, আজ বিশ বছর ধরে দুটো মানুষ এক ছাতের নীচে বাস করছে, অথচ একফোঁটা ভালবাসা নেই, বিশ্বাস নেই। শুধু একের অপরের ওপর অপরিসীম ঘৃণা।'

অনন্ত বললে 'কিন্তু সুরমা তো আত্মহত্যা করতে পারত।'

পশুপতি হাসলেন। 'তাতে আরও বেশি সাহসের দরকার। মনের কতখানি জোর একটা মেয়েমানুষের থাকতে পারে, অনন্তবাবু? ঘর থেকে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে আসতেই অনেকটা ফুরিয়ে গিয়েছিল। যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও সুরমার খরচ হয়ে গিয়েছিল জগদিন্দুকে বিষ দিতে গিয়ে। তারপর থেকেই ওর ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। সব সময় একটা অপরাধবোধ, হাত কাঁপে, পা কাঁপে, চোখের পাতা কাঁপে। কোন রকমে আজকের অস্থিহীন অস্তিত্বকে টেনে নিয়ে কালকের খাতায় জমা দিচ্ছে। ডাক্তারী ভাষায় একেই বোধ হয় স্নায়ুভঙ্গ বলে। সেই সুযোগে—'

'সেই সুযোগে কী।'

পশুপতি বললেন, 'সেটা জগদিন্দুর প্রতিহিংসার স্থূলতর দিক। এই যে হোটেল দেখছেন, এর সবই সুরমার টাকায়। ওর মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে জগদিন্দু ধীরে ধীরে ওর গহনার বাক্স গ্রাস করেছিল। আর—'

'আর কী?'

পশুপতি বিচিত্র হাসলেন। 'জগদিন্দুর ক্ষমা করার আরও একটা সর্ত ছিল। সেটা আরও স্থূল। কিন্তু সেটা আমার মুখে নাই বা শুনলেন। একদিন মাত্র এসেছেন, নিজেই টের পাবেন।'

হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে অনন্ত আলো জ্বালল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বেড়াল ওর বিছানা থেকে এক লাফে উঠে গিয়ে বসল জানালায়।

আশ্চর্য কিছু নয়, তবু সারা গায়ে কাঁটা দিল অনন্তর। চিনতে পেরেছে। এটাকেই জগদিন্দু রোজ ডেকে ডেকে ভাত খাওয়ায়, কে জানে, এটাই হয়ত কাল সারারাত ওর দরজার বাইরে কেঁদেছে। ঘৃণায় আক্রোশে আতঙ্কে মুহূর্তের জন্যে যেন বুদ্ধিভ্রংশ ঘটল অনন্তর। হাতে কিছু নেই। কিন্তু পায়ে জুতো আছে। সেটাই খুলে নিয়ে অনন্ত প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারল।

'পারলেন না, ফসকে গেল।'

চমকে ফিরে তাকাল অনন্ত। জগদিন্দু গাঙুলী। মৃদু মৃদু হাসছে। 'ফসকে গেল তো। ওটাকে মারা অত সোজা নয়, ওটা আসল শয়তানী। আজ সকালে পার করে দিয়ে এসেছিলুম। আবার এসেছে।'

অনন্ত তখনো হাঁপাচ্ছে। চোখের পাতা দুটোয় দপদপ উত্তেজনা কমেনি। কোনমতে চারপাইটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জগদিন্দুকে বলল, 'বসুন।'

জগদিন্দু বললেন, 'আজ এই হোটেলের এমন হাল দেখছেন, বরাবর এমন ছিল না। অন্নপূর্ণা হোটেল এক সময় লোকে গিসগিস করেছে। দু' তিনজন ঠাকুর বাবাজী রেঁধে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। সাত আটটা চাকর অহোরাত্র ফরমাস খেটেছে।

'তখন থাকবার আস্তানা বলতে ছিল ওই বলদেওদাস ধরমশালা, তার চামচিকে আর ইঁদুরের ভয়ে ওখানে বেশি লোক যেত না। আর হোটেল বলতে এই অন্নপূর্ণা আশ্রম। ভিড় হত শিবরাত্রির সময়ে সবচেয়ে বেশি, লোকে মজলায় স্নান সেরে মহাকালেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করত। মজলা কি আর নদী, পাহাড়ের ঘাম, ডুবগোড়ালি জল। তাতেই লোকের ভক্তি কত।

'সাধু-সন্ন্যাসীরা বেশিরভাগই উঠত ধরমশালায়, অনেকে আবার মন্দিরের বাইরের অশথ গাছটার নীচেই ধুনি জেলে শীতের রাত ফস

করে দিত। অন্যান্য যারা, ধরুন পুত্র কামনায় এসেছে, কিম্বা কোন মানত রক্ষা করতে, তারা আর যাবে কোথায়, উঠত এখানে এই অন্নপূর্ণা আশ্রমে।

'ভনভন মাছির মত ট্যুরিস্টের ঝাঁক পড়তে শুরু হয়েছে মাত্র এই বছর দশেক। এদের ধর্ম নেই, ভক্তি নেই, ক্যামেরার চামড়ার ফিতে-টাকেই পৈতে করে নিয়েছে। বছর পনের আগে এসেছিল সরকারী পেত্নীতত্ব বিভাগের লোক; তারা কবর খুঁড়ে খুঁড়ে বার করতে লাগল ক' হাজার বছর আগেকার মানুষের কঙ্কাল, ঘরদোর। খবরের কাগজে সে কী লেখালিখি। বাস, আর যাবে কোথায়। গন্ধে গন্ধে এল কলকাতা না বোম্বায়ের এক সাহেব হোটেল, ব্রাঞ্চ খুললে। তাদের দেখাদেখি আরও দুটো।

'তাদের সঙ্গে পারবে কেন অন্নপূর্ণা আশ্রম। এখানে কি লালজল খাওয়ানোর বন্দোবস্ত আছে, না এখানে নাচের সঙ্গে বাদ্যি বাজে। খদ্দের গেল, ঠাকুর গেল, চাকর গেল, প্যাহাড় বেয়ে নুড়ি গড়ানোর মত পড়তে থাকল জগদিন্দু গাঙ্গুলীর ভাগ্য।'

অনন্ত চুপ করে [illegible]। বলল, 'ক'জন বোর্ডার আছে এখন।'

জগদিন্দু বললেন, [illegible] আর,—আপনাকে নিয়ে তিনজন। মজুমদার মশায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে। উনি আছেন গোড়া থেকেই। সরকারী অফিসে কাজ করেন, হাড়কেপ্পন মশাই, বিশ বছর হোটেলে কাটালেন, তবু বাসা করলেন না, ন'মাস ছ' মাসে দেশে গিয়ে পরিবার পরিজন দেখেন আসেন। আরেকজনকে আপনি দেখেননি, তিনি ছ' মাস হল এসেছেন। কী এক কোম্পানীর এজেন্ট, ঘোরাঘুরির কাজ, এই হোটেলে, বুড়ি ছুঁয়ে থাকার মত, বিছানাটা শুধু পাতা থাকে, নইলে মাসের পঁচিশদিনই উনি কাটান ট্রেনে ট্রেনে।'

'এই দু'জন মাত্র লোক নিয়ে আপনার চলে?'

চলে আর কই। দায়ে ঠেকে জগদিন্দুকে চাকরি নিতে হয়েছে। ঠিক চাকরি নয়, নিম-স্বাধীন, পোষ্ট অফিসে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডার। সামান্য

কমিশন, মনি অর্ডার আর লেপাফায় পাত্তা লিখে দিয়ে আর কটা পয়সা হয়।

উঠে যেতে-যেতে জগদিন্দু বললেন, 'আমি তা হলে চলি এবার। আপনি বিশ্রাম করুন। যদি—যদি রাত্রে কোন অসুবিধে হয় তবে একটা খবর দেবেন। নিজে যদি না যেতে পারেন, সুরমাকে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন। এই দু'খানা ঘর পরেই থাকে।

কথায় কথায় মনটা হাল্কা হয়ে এসেছিল, জগদিন্দুর শেষ কথাটায় অনন্ত আবার চমকে উঠল। যত ভয় সব যেন এক সঙ্গে গ্রাস করছে ওকে। নিম গাছের ডালে সর সর শব্দ, চৌকাটের বাইরে সারারাত কান্না। আর নিঃশব্দ চপল পায়ে একটা বেড়ালের ঘরময় ঘোরাঘুরি। দরজা বন্ধ করে শুতে সাহস নেই, আবার খুলতেও ভয়। বেড়ালটাকে তাড়াতে চায়, হাত ওঠে না। বিছানায় পড়ে রইল ঝিম ধরে, ঘামল, আর মনে হল ওর নাক, চোখ, গলার ভেতরটা পর্যন্ত শাদা শাদা রোঁয়ায় ঢেকে গেছে।

সেই রাত্রে অনন্তর প্রবল জ্বর এল।

শ্রান্ত চোখ দু'টি মেলল, কত পরে, কতদিন পরে, তার হিসেব নেই, তখনো চেতনা আবিল, স্বপ্নাচ্ছন্ন। দেখল শিয়রে সুরমা দাঁড়িয়ে।

অনন্ত বলল, 'এ কী।'

'ওষুধ। উঠে বসতে পারবেন ?'

'পারব,' অনন্ত বলল, 'তুমি শুধু আমার হাত দুটো ধরো।'

উঠে বসেও অনন্ত অন্য দু'টি হাত ছাড়ল না। চোখে রাখল, কপালে, বলল, 'আঃ কী ঠাণ্ডা। আমার কত জ্বর হয়েছিল সুরমা ?'

ততক্ষণ আবার সেই বিহ্বল ভয়-ভয় দৃষ্টি ফিরে এসেছে সুরমার চোখে। বলল, 'একশো চার, পাঁচ। আমি এবারে যাই।' হাত ছাড়িয়ে সুরমা দরজার দিকে দু'চার পা এগিয়ে গেল।

অনন্ত সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে দিল ওষুধের গ্লাস। 'খাব না, খাব না আমি।' ওষুধ গড়িয়ে পড়ল বিছানায়, চাদর ভিজে উঠল।

সুরমা ফিরে এল, আঁচল দিয়ে মুছে নিল ওষুধটুকু। বলল, 'আপনি ভারি ছেলেমানুষ তো। কী করতে হবে বলুন।'

ঘোলাটে চোখের চাউনি ততক্ষণ অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে অনন্তর। ভাল ছেলের মত শুয়ে পড়ল, চোখ বুজে আবদারের গলায় বলল; 'কিছু না, শুধু এখানে বসে থাক তুমি।'

নিঝুম ঘুমঘুম কয়েক মিনিট কাটল। আবার শিরশিরে ভয় নামল অনন্তর দুর্বল মগ্নচৈতন্যে। একবার মনে হল সে একা শুয়ে আছে, সুরমা কখন উঠে গেছে পা টিপে টিপে। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল। না যায়নি তো। যেমন ছিল, তেমনি বসে আছে শিয়রে, সন্ত্রস্ত, আড়ষ্ট। আবার অনন্ত একখানা শীর্ণ রুগ্ন হাত টেনে নিল মুঠিতে। ধীরে ধীরে বলল, —আমি এখান থেকে চলে যাব সুরমা।

সুরমা সাড়া দিল না।

অনন্ত আবার বলল, 'কাল সকালেই। কলকাতা না গেলে এ জ্বর আমার ছাড়বে না।'

'ক ল কা তা' সুরমা উচ্চারণ করল ধীরে ধীরে, প্রতিটি বর্ণ স্বতন্ত্র করে।

অনন্ত বলল, 'কলকাতা তোমার মনে আছে সুরমা?'

'আছে', সুরমা বলল, প্রথমে, তারপরই তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল, 'কি জানি, হয়ত নেই।'

অস্থিরভাবে অনন্ত বলে উঠল, 'আমি তোমার কথা সব শুনেছি।'

সুরমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল, ওর মুঠিতে বন্দী হাতখানা ছুঁয়ে থেকেই অনন্ত সেটা অনুভব করল। সেই হাতখানা একবার রাখল কপালে, একবার চোখের পাতায়, টেনে আনল নাকের ডগায়, তারপর ঠোঁটে ছোঁয়াতে গিয়েই অনন্ত বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলো। এই হাতেই কি সুরমা বিষ তুলে দিয়েছিল জগদিন্দুকে? দপ দপ করে উঠলো কপালের শিরা, গলা শুকিয়ে গেল, প্রবল বিতৃষ্ণায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে অনন্ত শুধু বলতে পারল, 'একটু জল।'

আগ্রহে ছিনিয়ে নিয়ে গ্লাসের উপর ঝুঁকে পড়ল অনন্ত, সঙ্গে সঙ্গে হাত থর থর কেঁপে উঠলো। দেখতে পেয়েছে। অসহায় শিশুর মতো অনন্ত আর্তনাদ করে উঠল, 'ফেলে দাও, ফেলে দাও, বেড়ালের রোঁয়া গ্লাসে কিলবিল করছে, এ জল আমি খাব কী করে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে অনন্ত শুয়ে পড়ল, গোঙাতে থাকল, জল গড়িয়ে মেঝে ভেসে যাচ্ছে, যাক! ক্ষিপ্র হাতে সুরমা সেই জলে ভিজিয়ে নিল আঁচল, অনন্তর তপ্ত কপাল, নিমীলিত চোখের পাতা দুটি, মুছে দিতে থাকল।

ঠিক তখনই বাইরে কী একটা শব্দ হল। চকিতে মুখ ফিরাল সুরমা। কেউ না। একবার মাত্র গলা খাঁকাড়ি দিয়েই পশুপতি মজুমদার অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

পশুপতি মজুমদার বিকেলের দিকে সরকারীভাবে দেখতে এলেন। অনন্ত ততক্ষণ অনেকটা সামলে উঠেছে।

পশুপতি বললেন, খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন মশাই। মাঝে মাঝে এমন অসুখ হয় নাকি আপনার।

অনন্ত একটু লজ্জিত হাসল। 'সেবার অসুখের পর থেকেই…মাঝে মাঝে—মানে একটু অনিয়ম হয়েছিল কিনা।' বালিশগুলো জড়ো করে আনল পিঠের কাছে, ঠেস দিয়ে বসে ফের বলল, 'আমি কালই চলে যেতে চাই পশুপতিবাবু। আপনি একটু বন্দোবস্ত করে দেবেন, এই টিকিট কাটা, গাড়িতে তুলে দেওয়া-টেওয়া আর কী।'

পশুপতি বললেন, 'এ আর বেশী কথা কী। কিন্তু হঠাৎ কী হল বললেন না তো।'

অনন্ত ম্লান হেসে বলল, কিছু না। আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব পশুপতিবাবু, জবাব দেবেন?

'প্রশ্ন না শুনে বলতে পারছিনে।'

'সেদিন আপনি জগদিন্দু যে যে সর্তে সুরমাকে ক্ষমা করেছিল, তার

কিছু আভাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আরও একটা সর্ত ছিল, কিন্তু সেটা কী, পশুপতিবাবু?'

পশুপতিবাবু বিচিত্র হাসলেন।...আজও জানেন না? আপনি অবাক করলেন মশাই। এ হোটেলে তেরাত্তির না পেরোতেই সব বোর্ডার কথাটা টের পেয়ে যায় যে। আপনিও পেয়ে গেছেন ভেবেছিলুম। বিশেষ —পশুপতি এখানে একটু অর্থপূর্ণ কাশলেন, 'আজ তাড়াতাড়ি ফিরলুম। তখনই আপনাকে দেখে যাব ভাবলুম, কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারলুম না।'

'কেন?'

পশুপতি আবার একটু হাসলেন। 'দেখলুম, আপনার মাথাটা কোলের মধ্যে নিয়ে একজন আঁচল নিংড়ে নিংড়ে...'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিলে অনন্ত...'হ্যাঁ, সুরমা। কিন্তু তার সঙ্গে সর্তের সম্পর্ক কী, পশুপতিবাবু। আপনি আসল কথাটা কেবলই এড়িয়ে যাচ্ছেন।'

একটু ভ্রূকুটি করলেন পশুপতিবাবু, একটু বা রুষ্ট হলেন,...'ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা আমার স্বভাব নয়, অনন্তবাবু। শুধু একটা কদর্য কথা আভাসে বলতে চেয়েছিলুম। শুনুন তবে।' মুখের পেশী কঠিন হয়ে এল পশুপতির, খাদগলায় ধীরে ধীরে বললেন, 'গত বিশ বছর ধরে যত-জন এই হোটেলে বাস করে গেছে অনন্তবাবু, তাদের প্রায় কাউকেই একলা রাত কাটাতে হয়নি।'

অনন্তর পাণ্ডুর মুখ ভরে গেছে রক্তোচ্ছ্বাসে। দীর্ঘ, রুক্ষ, অবিন্যস্ত চুলগুলো ধরেছে মুঠি করে। একটি ভ্রমর যেন এতক্ষণ মঞ্জরের মধ্যে চক্রাকারে গুণ গুণ করছিল, এবারে হঠাৎ দংশন করেছে কোরকের মর্ম-মূলে। যন্ত্রণায় মুখপেশী বিকৃত হয়ে গেছে, প্রাণপণে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে অনন্ত।

কখন উঠে ঘরময় পায়চারী করতে শুরু করেছিল, একবার থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'এই সর্ত?'

পশুপতি বললেন, 'এই।'

'এতে জগদিন্দুর লাভ।'

ভয়ঙ্কর একটা কথা বলে পশুপতি ভারমুক্ত হয়ে গেছেন, এখন আর সঙ্কোচ নেই। অনায়াসে বললেন, 'দ্বিবিধ। এক, সুরমাকে শাস্তি দেওয়া। দুই…'

অনন্ত বললে, বুঝেছি, হোটেলের স্বার্থ। কিন্তু এতে কি সত্যিই কোন লাভ হয়?

'আগে হত। এখন আর হয় না। সুরমার বয়স হয়েছে। তা ছাড়া এখনকার লোকের রুচি বদলেছে। অন্যান্য হোটেলেও, এখানকার মত এতটা খোলাখুলি, স্থূল, না হলেও এণ্টারটেনমেণ্টের আয়োজন আছে। সেখানে গান আছে, বাজনা আছে, নাচ আছে। সুরমার কতটুকু পুঁজি বলুন।'

কিছুক্ষণ পরে অনন্ত বললে, 'আমার আর একটা সংশয় আছে। আপনি যা বলছেন তা যদি ঠিক হয়, তবে, তবে, প্রথম দিকে সুরমা কেন আমার ঘরে আসতে চায়নি! সব সময় কী একটা সঙ্কোচ, ভয় দেখেছি ওর চোখে।'

সর্বজ্ঞের মত হাসলেন পশুপতি।—তারও ব্যাখ্যা আছে। যত লোক আসে, তাদের সবাই তো সমান হয় না অনন্তবাবু। তাদের একজন সুরমাকে একবার সন্তান দিয়েছিল, আরেকজন রোগ। সেই থেকে আগন্তুক এলেই সুরমার আতঙ্ক।

রুদ্ধ, দ্রুত, চাপা স্বরে অনন্ত বলে উঠল, 'কী হল সেই ছেলে?'

'জগদিন্দু জাতমাত্র নষ্ট করেছে।'

'আর রোগ?'

'সেরেছে কিনা বলতে পারি না।'

পশুপতি উঠবেন উঠবেন করছিলেন, অনন্ত শিশুর মত তাঁকে আঁকড়ে ধরল।…'আরেকটা কথার জবাব দিয়ে যান পশুপতিবাবু।' গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিল অনন্ত, যেন কথাটা কী ভাবে বলবে স্থির করতে পারছে না।…'আজ বিশ বছর ধরে যতজন এই হোটেলে এসেছে,

তাদের সবাইকে সুরমা কি শুধু ঘৃণাই করে গেছে, একজনের ওপরও মায়া পড়েনি?'

'পড়েছিল বৈকি।' পশুপতি আবার পুরনো দিনের পাতা ওল্টালেন। 'তখন সবে এখানে এক্সকাভেশান শুরু হয়েছে। সামান্য কিছু কিছু পাওয়া গেছে, তার ঐতিহাসিক মূল্য অনিশ্চিত। সরকারী গ্রাণ্ট নিয়ে এখানে রিসার্চ করতে এল নীলাম্বুজ মৈত্র। বয়স বেশি না, তেইশ কি চব্বিশ। ভাসা ভাসা বড় বড় দুটি স্বপ্নদেখা চোখ; শুধু অতীতের প্রস্তরমূর্তিতেই দিব্যরূপ দেখে না, রক্তমাংসের নারীদেহেও দেখে। সুরমা যথারীতি ওকে আত্মদান করল, কাঁচামন নীলাম্বুজ ভাবল প্রেম। রিসার্চ মাথায় থাকল, দিনরাত রুদ্ধদ্বার ঘরে দুজনের গল্প। প্রথমে নীলাম্বুজ লাজুক ছিল, ভাল করে গুছিয়ে কথা বলতে জানত না, সুরমা ওকে সাহস দিয়েছে। মনের মত শ্রোতা পেয়ে নীলাম্বুজ মহাখুশী। আলাপের পাল তুলে ওরা ইতিহাসের উজানে চলে যায়: আসিরিয়া, বাবিলন, মেম্ফিস, মহেঞ্জোদড়ো। সুরমা শোনে, বোঝে, বোঝে না, বোঝার ভাণ করে।'

'ওরা বুঝি এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার সংকল্পও করেছিল। কিন্তু কোথায় একটা অঘটন ঘটল, দু মাসের মাথায় নীলাম্বুজের নামে সরকারী চিঠি এল: তোমার রিসার্চের কোন প্রোগ্রেস দেখা যাচ্ছে না, পত্রপাঠ চলে এস।'

'এর আগে বুঝি ঠিক ছিল, এখানকার কাজ শেষ হলেই নীলাম্বুজের পাকা চাকরি হবে, নালন্দা মিউজিয়মে। স্বপ্নসৌধ ধ্বসে পড়ল নিমেষে। বিরস মুখে নীলাম্বুজ যখন ঘোড়াগাড়িতে গিয়ে উঠল, তখন ওর মুখের চেহারা যদি দেখতেন!'

'এখানেই শেষ?' অনন্ত জিজ্ঞাসা করল।

'এখানেই।' পশুপতি বললেন, 'নীলাম্বুজ সুরমাকে কী ভরসা দিয়ে গিয়েছিল জানি না। তারপর মাসখানেক ধরে প্রতিদিন পিওন আসবার সময় সুরমা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নীলাম্বুজের একটা ফোটো বুঝি ওর কাছে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে সেটা দেখেছে।'

'চিঠি আর আসেনি ?'

'মনে তো হয় না। তা ছাড়া নীলাম্বুজের সরকারী চাকুরিও আর হয়নি। যতদূর শুনেছি ও আজকাল একটা বেসরকারী কলেজে মাষ্টারী করছে, আর এনসেণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রীর কোচিং ক্লাস খুলেছে ছাত্রদের নিয়ে।'

আর কেউ ?

আরো একজন এসেছিল, প্রায় বছর পাঁচেক পরে। ফেরারী পলিটিক্যাল আসামী, গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। তার আসল নাম জানা যায়নি, এখানে যে নাম লিখিয়েছিল, সেটা পশুপতির ঠিক মনে নেই, সুধন্য কিম্বা ওই রকম কিছু হবে।

সেই সুধন্য সান্যালকেও ভালবেসেছিল সুরমা। আকৃতিতে সুধন্য নীলাম্বুজের ঠিক বিপরীত ; ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, এক জোড়া কর্কশ গোঁফ, নিরস্কুর দাড়ি কামানো, অমিশুক। মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকত। কিন্তু সেই আপাত-উদাসীনতার পর্দাও সুরমা সরিয়েছিল। পুঁথিপত্র থেকে পড়ে পড়ে সুধন্য নানা রাজনৈতিক মতবাদ ব্যাখ্যা করে শোনাত, সুরমা শুনত। সুধন্যও ওকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

বাড়াবাড়ি শুরু হতেই জগদিন্দু রাশ টানলে। এতটা সে চায়না, খদ্দের লক্ষ্মী, তাদের খুশি রাখতে হবে বইকি। একটু মাখামাখি, একটু শরীরের প্রয়োজন মেটান, কিন্তু তার সঙ্গে আবার মনের আপদ জোটে কেন।

সুতরাং দিনকত পরেই হোটেলের আশে-পাশে পুলিশের চর ঘোরা ঘুরি শুরু করল। বেগতিক দেখে সুধন্য একদিন সরে পড়ল শেষ রাতে।

'জগদিন্দুই পুলিশকে খবর দিয়েছিল ?'

'দিতে পারে' পশুপতি হাই তুলে বললেন, 'আবার নাও পারে। হয়ত পুলিশ এমনিই গন্ধে-গন্ধে এসেছিল।'

'সুধন্য আর কোন খবর নেয়নি ?'

—সম্ভব না। ওর খান দুই বই ফেলে গিয়েছিল, তাতে ঠিকানা লেখা ছিল। সেই বই থেকে সুরমাকে দু'বেলা ধুলো ঝাড়তে দেখেছি, লুকিয়ে সুরমা দু-একটা চিঠিও লিখে থাকবে। জবাব আসেনি।

আর সুরমা?

'সুধন্যর সন্তান তখন ওর গর্ভে।' পশুপতি উঠে দাঁড়ালেন, 'সেই সন্তানটির কী হল, আপনাকে আগেই বলেছি।'

অনন্তও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল—আর একটা শুধু প্রশ্ন পশুপতিবাবু। আপনি এত খবর রাখতেন কী করে। এ গল্পে আপনার তো কোন ভূমিকা নেই।

মৃদু হসলেন পশুপতি।…'নেই বলেই ত রাখা সহজ হয়েছে অনন্ত-বাবু। একটা জিনিস ভুলবেন না, আমি আপনাদের চেয়ে ঢের বড়। শুধু অনুভব দিয়েই অনেক কিছু বুঝতে পারি। বয়সই মানুষের তৃতীয়, দিব্য নয়ন।'

ব্যাখ্যাটা অনন্তর ঠিক মনঃপূত হল না, কিন্তু আর প্রশ্ন করবার সময় ছিল না। পশুপতি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেছেন।

বাক্স বলতে একটা সুটকেশ, বিছানাও সামান্যই। গুছিয়ে নিতে বেশি সময় লাগল না। জগদিন্দুর সঙ্গে অনন্ত ইতিমধ্যে দেখা করে এসেছে। হিসাবপত্র নিয়ে বোঝাপড়াও সারা।

যতক্ষণ মন স্থির হয়নি অনন্তর ততক্ষণ, এই ঘর, এই শ্বাসরোধকারী পরিবেশ যেন পাষাণ হয়েছিল বুকের ওপরে। তবু আশ্চর্য, এই যাবার প্রাকমুহূর্তটিতে একটা অদ্ভুত বেদনাক্ত শূন্যতা বোধ হচ্ছে। ফেলে যাচ্ছে না কিছু—চশমা, রুমাল, চাবি, হাতঘড়ি সব ঠিক ঠিক জায়গাতেই আছে, এমন কি পুরনো চপ্পল জোড়াও কাগজে মুড়ে নিতে ভোলেনি। তবু। কী যেন নিতে চেয়েছিল, কিন্তু থুয়ে যেতে হল, মনের কৌটোয় ধরা না দেওয়া একটা ছটফট মৌমাছি।

'ঘোড়াগাড়ি এসে গেছে।'

অনন্ত জানালার শিক ধরে বাইরে নিম গাছটার দিকে চেয়ে ছিল, পিছন ফিরতেই দেখল সুরমাকে। বিব্রত, কুণ্ঠিত, নতনেত্র। সঙ্গে সঙ্গে সনাক্ত হয়ে গেল অস্বস্তিটুকু।

'গাড়ি এসে গেছে।' সুরমা আবার বলল।

'এই যে যাই।' স্যুটকেশ হাতে নিয়ে অনন্ত উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে নিমগাছের ডালে সরসর ডানাঝাপটানি শোনা গেল, জ্যোৎস্না-অন্ধ ছুটো পেঁচা বুঝি আশ্রয় খুঁজছে পাতার অন্ধকারে, অনেক দূরে কেঁদে উঠল শীতার্ত একটা কুকুর, এক দমক হিম হাওয়ায় দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে হাঁ হল ফের, মেজের চুণবালি খসে পড়ল, আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চার পাইয়ের তলা থেকে লাফ দিয়ে একটা বেড়াল গিয়ে জানলার ওপর বসল—স্থির, হিংস্র পিঙ্গলাক্ষী।

আর কিছু ভাবনার প্রয়োজন হল না, নেশালস সম্মোহিত কণ্ঠে অনন্ত বলে উঠল, 'তোমাকেও আমি নিয়ে যাব সুরমা।'

কৃশকর্কশ একখানা হাত থর-থর কাঁপছে অনন্তর মুঠিতে, কিন্তু সুরমার মুখ-ভঙ্গির লেশ মাত্র পরিবর্তন হয়নি। বলল, 'কোথায়।'

'কলকাতা'। সব ব্যবস্থা ঠিক করে সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসব। তুমি এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিও। তোমাকে এখানে ফেলে রাখতে পারব না।'

'কেন।'

নির্বিকার, নিরুৎসাহ প্রশ্ন। অনন্তর একবার মনে হল কঠিন কিছু দিয়ে আঘাত করে করে এই অবোধ হিমরক্ত মেয়েটির দেহে প্রাণ এনে দেয়। পরমুহূর্তেই আবার স্নিগ্ধ ঘন আবেগের মেঘে ওর মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এল। সুরমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে অনুনয়গাঢ় স্বরে অনন্ত বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, এখানে থাকলে তুমি মরে যাবে?'

সুরমা স্পষ্ট, অবিচল স্বরে বলল 'মরে তো আমি কবেই গেছি, অনন্তবাবু।'

ওর কাঁধ ধরে প্রবল, অসহিষ্ণু ঝাঁকুনি দিয়ে অনন্ত বলল, 'না, না

মরোনি। চলো একবার সেখানে, দেখবে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার কত পথ আছে মেয়েদের। একটি কি দুটি ভুল করলেই সে পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। শুধু সাতটি দিন ধৈর্য ধর সুরমা। তোমার জীবনের এখনও অনেকখানি বাকি আছে।'

'আছে?' এতক্ষণে বুঝি একটু দীপ্তি দেখা গেল সুরমার মুখে, কণ্ঠস্বর একটু বুঝি ব্যগ্র শোনাল।

অনন্ত বলল, 'আছে।'

ঘোড়ার খুরের শব্দ টিকটিকির ডাকের মত ক্ষীণ হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেছে। দরজা বন্ধ করে সুরমা ফিরে এসেছে ঘরে। পুরনো কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে বেতের একটা ঝাঁপি, তার ভেতরে আবার ওর নিজস্ব কয়েকটা টুকিটাকি।

অনন্তর নাম ঠিকানা লেখা একটা কার্ড তখনো আছে মুঠিতে। এই সাতদিনের মধ্যে হঠাৎ কিছুর দরকার হলে অনন্ত বলে গেছে, চিঠি লিখতে। সাবধানে রাখতে হবে এটা।

ঝাঁপির ওপরের দিকে কতদিনের পুরনো রেশমী রুমাল, পাথরের মালা একছড়া···আজও যা হাতছাড়া হয়নি···সেকালের ঝালরহাতা কয়েকটা জামা, ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু বিশ বছর আগেকার গন্ধ লেগে আছে। দরকারী-অদরকারী জিনিষের স্তূপ সরিয়ে কার্ডটাকে নিরাপদ নিচে রাখতে যাবে, চোখে পড়ল আরও দুটো কাগজ; বিবর্ণ, হলদে, তবু চেনা যায়। একজন ওকে দিয়ে গিয়েছিল সই-করা ফটো, আরেক-জন নিজে হাতে লিখে দিয়েছিল নাম-ঠিকানা। ফটো আর চিরকুট, ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি।

দশ পনেরো বছর ধরে এখানে একভাবে চাপা পড়ে আছে। পাশা-পাশি দুটি কবর।

অনন্তর কার্ডখানা ওদের পাশে শুইয়ে দিল সুরমা। আরও একটি।

একটু পরেই সদরে কড়কড় কড়া নড়ে উঠল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে [illegible]

ছায়া পড়ল ঘরে। চমকে ফিরে তাকাল সুরমা। জগদিন্দু। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন কোন গেষ্ট এসেছে হয়ত। নির্বাক জগদিন্দু কঠিন তর্জনীর ইশারায় ওকে বলছে দরজা খুলে দিতে।

ঝাঁপি বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সুরমা। ভীত দুটি চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'যাই !'

বিষ

কালীকৃষ্ণ ডাক্তারকে একখানি একশো টাকার নোট দিল অনঙ্গমোহন ; তারপর আরেকখানা, গোবিন্দ দারোগাকে।

দুজনকে বিদায় করে স্ত্রীর ঘরের সমুখে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল। ইতস্তত করল এক মুহূর্ত, পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল।

জেগে আছ ?

জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন ছিল না। মৈত্রেয়ীর শীতল শান্ত দুটি চোখ খোলা। চটি খুলে অনঙ্গ ঘরে পা দিল। পাথরের বাঁধানো মেঝে, শাদাকালো দাবার ছকের ডিজাইন, ঠাণ্ডা। আরও কতবার তো এ ঘরে এসেছে অনঙ্গ, কিন্তু পায়ের পাতা দুটি এমন হিম হয়ে যায়নি।

শিয়রে বসে সন্তর্পণে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ ?'

চোখ দুটি ধীরে ধীরে বুজে এল মৈত্রেয়ীর, অনঙ্গ একটি ক্ষীণকণ্ঠ জবাব পেল, 'বড়ো ক্লান্ত।'

আস্তে আস্তে ওর চুলে হাত বুলিয়ে অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন এ কাজ করলে মৈত্রেয়ী ; কেন বিষ খেলে ?'

চকিত হয়ে মৈত্রেয়ী আবার খুলল চোখ দুটি—'ডাক্তার চলে গেছে ?'

'গেছে।'

'পুলিশ ?'

'পুলিশও। সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। এটা যে আত্মহত্যার চেষ্টা, সেটা যাতে যথাসম্ভব গোপন থাকে, সে ব্যবস্থা করে এসেছি।'

অনঙ্গ হয়ত ভেবেছিল মৈত্রেয়ী আশ্বস্ত হবে ; কৃতজ্ঞ একটু হাসি ফুটবে ওর মুখে ; নিরাশ হতে হল। একটু পরে অনঙ্গ বলল, 'কিন্তু, কেন তুমি এ কাজ করতে গিয়েছিলে মৈত্রেয়ী ? কেন বিষ খেয়েছিলে ?'

হঠাৎ যেন মৈত্রেয়ীর উত্তেজনা দেখা দিল, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। সোজা হয়ে উঠে বসতে গেল, ক্ষীণ অথচ শাণিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে বলেছে আত্মহত্যা ?'

বিমূঢ় গলায় অনঙ্গ বলল, 'তবে কী !'

মৈত্রেয়ীর চোখ থেকে ঘোলাটে, অস্থির চাউনি তখনও মুছে যায়নি, বলল, 'হত্যা।—হত্যার চেষ্টা।'

অনঙ্গর আঙুল অসাড় হয়ে গেল, ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এ কথার অর্থ কী মৈত্রেয়ী। বলো কী ব্যাপার ; কাকে তোমার সন্দেহ।'

ততক্ষণ মৈত্রেয়ীর চোখ দুটি ফের বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রান্ত বুকের ওঠাপড়া ছাড়া জীবনের কোন স্পন্দন নেই। অতি ক্লান্ত, নিমগ্ন কণ্ঠে মৈত্রেয়ীকে বলতে শোনা গেল, 'বড় ঘুম পেয়েছে, একটু ঘুমোতে দাও। বলব, পরে তোমাকে সব বলব আমি।'

আবার পা টিপে টিপে শিয়র থেকে অনঙ্গ উঠে এল। পাথরের মেজে ঠাণ্ডা। বাইরেও কনকনে হাওয়া। আজ সারাদিন বাগানের দেবদারু গাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে, পড়ছে। অনঙ্গ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ঢুকল পড়ার ঘরে। জানালা থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মনে হল, এখনো কারা যেন ফিসফাস করছে রাস্তার মোড়ে ; যে চাকরটা আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, তার চোখেও যেন কৌতুক, কৌতূহল।

সারা বছর কোন কিছু ঘটে না যে-গ্রামে, একটা গাছ কাটা হলে লোকে সারবন্দী দাঁড়িয়ে যায়, সেখানকার পক্ষে একটু কড়ারকমের চাঞ্চল্য বই কি। বিশেষ, কাণ্ডটা যদি জমিদারবাড়ীর হয়। অনঙ্গমোহনের মা মৃণালিনী মারা গেছেন এই সেদিন, আশ্বিনের শেষে। অনঙ্গর স্ত্রী মৈত্রেয়ী আজ বিষ খেয়েছেন।

অনঙ্গ অবশ্য চাপা দিতে চেষ্টার কসুর করেনি। কিন্তু লোকে সদরের বড় ডাক্তার কালীকৃষ্ণ সরকারকে আসতে দেখেছে : ফটফট টায়ারের ধুলোর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়েছে খবর। ঘণ্টা তিনেক অক্লান্ত যুঝে ডাক্তার

বিদায় নিয়েছেন, অবস্থা একটু ভাল দেখে। এখন ঘুম চাই শুধু, নিবিড় পরিপূর্ণ ঘুম।

ঠিক তখুনি এসেছে গোবিন্দ দারোগা। এদিক ওদিকে মিটিমিটি চেয়ে বলেছে, 'খবর সব ভাল? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম জমিদারবাবুকে সেলামটা সেরে আসি। তা, বাড়ির হাতাতে ঢুকতেই শুনলাম বৌরাণীর খুব ব্যামো!'

জবাব দিতে গিয়ে তোতলামি এসে গেল জবরদস্ত জমিদার অনঙ্গ-মোহনেরও।—'ব্যামো? কই, না তো! একটু বদহজম হয়েছিল, সেরে গেছে।'

—'সেরে গেছে? গেলেই ভাল। সদরের কালীকেষ্ট ডাক্তারের গাড়িটা দেখলাম কি না। টাকা বেশী নিলে কি হয়, লোকটা ধন্বন্তরি।'

দারোগা তবু উঠল না। সন্দিগ্ধ গোঁফজোড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ বাড়ির থমথমে আবহাওয়ায় কী একটা গন্ধ খুঁজল। ওর রোমাকীর্ণ নগ্ন দুটি জানুর দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় কাঁটা দিয়েছিল অনঙ্গমোহনের শরীরে। পারলে বুঝি লাথি মেরে দূর করে দিতো এই খাকিশার্ট গোলামটাকে।

কিন্তু মনের ভাব মনে রেখে ফরমাস করতে হল পানের; জিজ্ঞাসা করতে হল, জর্দা, কিমাম, সুর্তি? সেই সঙ্গে একশো টাকার নোটের মশলা দিতে ভুল হল না।

অনঙ্গ কাছারি-ঘরে ঢুকেছিল কিছু কাজ সারবে বলে, মন বসল না। শোবার ঘরে ফিরে একটা পত্রিকা তুলে নিল, মনে হল, সব সাজানো কথায় ছেলেমানুষি।

পাশের স্তিমিত-দীপ ঘরে মৈত্রেয়ীর তখন আবার ঘুম ভেঙেছে, দেহ এখনও বিবশ, চেতনা আচ্ছন্ন। মৈত্রেয়ী দুহাতে চোখ ঢাকল উটপাখি আশায়—যদি ঘুমোন যায়, যদি রেহাই মেলে দুর্ভাবনার শিকারী কুকুর-গুলোর হাত থেকে।

মিলল না। আজ থেকে বছর দশেক আগে এমনি এক হেমন্ত গোধূলিতে যে নববধূ এ-বাড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিল, ফিরে ফিরে তাকেই মনে পড়তে লাগল। পরনে রক্তাম্বর, অবনমিত নয়ন, গুণ্ঠনাবৃত, স্বর্ণ-ভূষণমণ্ডিতা। দুধ-আলতা-ঢালা পাথর-থালায় দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে, মুহুর্মুহু উলু আর শাঁখের ধ্বনির মধ্যে বরণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই কি তার আসল রূপ!

না। আসল মানুষটা জ্বলছে ভেতরে, পোশাকের এত যে জাঁক-জমক, এতো শুধু বেলোয়ারি কাচ।

যোটকটা একটু বিষম বৈ কি; কোথায় মফঃস্বলের ঢলঢলকাঁচাঅঙ্গের লাবণি ধনী-তনয়, আর কোথায় কৃশা, শ্যামাঙ্গী একটি মেয়ে, দূরসম্পর্কিত আত্মীয়ের আশ্রিতা, গোপন সমিতির সভ্যা, আটপৌরে শাড়ি আর ছেঁড়া স্যাণ্ডাল পরে যে সারা শহর চষে বেড়ায়; এই সেদিনও বেআইনী একটা সভায় পুলিশের লাঠি পড়েছে যার পিঠে।

শাশুড়ী জিভে মধু দিলেন, কানে ছোঁয়ালেন, মৈত্রেয়ী আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল। শাশুড়ী বললেন, 'বৌমা চোখ খোল।'

বৌ মুখই তুলতে পারে না। অথচ মনের ভেতরটা তখন হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। নীরদদা আসুক, দেখে যাক নিপুণ অভিনয় করছে কিনা মৈত্রেয়ী।

সমস্ত ব্যাপারটা নাটকীয়, সন্দেহ নেই। জটিল মামলা নিয়ে অনন্ত গিয়েছিল কলকাতায়; উঠেছিল সলিসিটর মনোমোহন মিত্তিরের ওখানে।

ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবী, পম্প-শু, পরিপাটি টেড়ি। নধর গৌর কান্তি দেখে মনোমোহনের বাড়ি হাসির ধুম পড়ে গেল। এ বাড়ির সবাই ঘোর স্বদেশী; অসহযোগের ঝোঁকে মনোমোহন নিজেই একবার প্র্যাকটিস্ ছেড়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা সবাই, খদ্দর না হোক, মোটা মিলের ধুতি ছাড়া পরে না। বড় ছেলে নীরদের রাজনীতি আরো ঘাঁ-ঘেঁষা। ভয়ানক কোন উপায়ে ইংরেজ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখে। সেই দলে যোগ দিয়েছিল মৈত্রেয়ীও।

নীরদ একদিন মৈত্রেয়ীকে তিরস্কার করল।

—'ওকে নিয়ে তোমরা দিনরাত কীএত হাসি-মস্করা কর বলো তো।'

মৈত্রেয়ী বললে, 'হাসব না? লোকটা কী সঙ, দেখনি? রোজ সন্ধ্যায় গায়ে কতটা আতর ঢেলে বেড়াতে যায়, জানো?'

'ঢালবেই তো', নীরদ বললে, 'মফঃস্বলী বড়োলোক, ওরা কলকাতা আসেই রেস খেলতে, বাইজীর বাড়ি যেতে, নয়ত কোন অসুখ সারাতে। মামলাটা তো ছুতো। হাসি-ঠাট্টা নয় মৈত্রেয়ী, এই লোকটার কাছ থেকে কিছু টাকা যদি বাগিয়ে নিতে পার, তবে পার্টির একটা বড় কাজ হয়।'

মৈত্রেয়ী বললে, 'এ আর শক্ত কী।'

টাকার কথা শুনে অনঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কিসের টাকা, জিজ্ঞাসা করল না, বলল, 'কত?'

মৈত্রেয়ী একটা অঙ্ক বলল।

অনঙ্গ—'বেশ ত এখন কোর্টে বেরুচ্ছি। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে দেব।'

সেই সন্ধ্যার কথা মনে হলে মৈত্রেয়ীর এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। লোকটা এখন এমন ভিজেবেড়াল হয়ে গেছে তখন কিন্তু অন্য প্রকৃতির ছিল। গায়ে ছিল অসম শক্তি, গ্রামের জমিদার, যেমন সখ, তেমনি সাহস। লুটপাটে তেমনি দুরন্ত, লাঠির জোরে বরাবর দখল করেছে মাটি, টাকার জোরে মেয়েমানুষ।

নইলে ভূমিকা করল না, টাকাটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে দরজা ভেজিয়ে দিল, জোর করে চেপে ধরল হাত? কী কঠিন, কলুষ-স্পর্শ! মৈত্রেয়ী নিজেকে ছাড়াতে গিয়েছিল, পারেনি; বরং সামলাতে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল লোকটার বুকে। মনে হল, সমস্ত জামাকাপড়ে আগুন ধরে গেছে, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কী?'

'কিছু না।'

খানিক পরে নিজে থেকেই অনঙ্গ আবার খুলে দিল দরজা। ওর

কানের কাছে মুখ নামিয়ে নীচু স্বরে বলল, 'আমরা ভদ্রলোক। ঝোঁকের ওপর এক একটা কাজ যেমন করে ফেলি, তার প্রায়শ্চিত্তও করি। আমি তোমাকে বিয়ে করব, মৈত্রেয়ী।'

আর কাউকে একথা বলতে পারেনি, মৈত্রেয়ী নালিশ করেছিল নীরদের কাছে।

সব শুনে নীরদ গম্ভীর হয়ে গেল। অনেক পরে বলল, 'নরপশুটার ইহলীলা ইচ্ছে করলে তো এখুনি সাফ করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে তো আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তুমি ওকে বিয়েই কর মৈত্রেয়ী।'

'বিয়ে?' তখন চেঁচাতে পারেনি, এখন আর্তকণ্ঠে মৈত্রেয়ী বলে উঠল, 'তুমি কী বলছ নীরদদা?'

'ঠিকই বলছি', নিষ্ঠুর, নিশ্চল স্বরে নীরদ বলল, 'এ ছাড়া উপায় নেই। এ বরং গরলে অমৃত হল।' মৈত্রেয়ীর মাথায় একখানা হাত আলগোছে রেখে নীরদ আবার বলল, 'আমাদের কাজে যে অনেক টাকা লাগবে মৈত্রেয়ী। তোমার আত্মবিসর্জনের কথা দেশের মুক্তি-ইতিহাসে লেখা থাকবে।'

নিষ্প্রদীপ ঘরে খস খস শব্দ। আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া, তবু মৈত্রেয়ী কেঁপে উঠল। কে? কেউ না। কী? কিছু না। দেয়ালপঞ্জীর পাতাগুলো ওলটাচ্ছে হাওয়ায়, অনঙ্গমোহনের পূর্বপুরুষের তৈল-প্রতিকৃতি ঠক ঠক কাঁপছে। মৈত্রেয়ীর বিষক্রিয়াবিবশ চেতনা আবার তলিয়ে গেল, সীসে-বাঁধা শোলার মত, ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত, দশ বছর অতীতের গহ্বরে।

বিয়ের পর প্রথম কদিনেই মৈত্রেয়ী হাঁপিয়ে উঠেছিল। এত লোক এ বাড়িতে, এত কিচিরমিচির, মানুষ বাঁচে কি করে! এই মাসিপিসি, দেওর ননদদের সবাইকে সে চেনে না, কে কত আপন, কে গুরুজন, কে লঘু, জানা নেই, সবার সমুখেই আধ হাত ঘোমটা টেনে বেড়াতে হ'ত, সে বড় অস্বস্তি। এত যে ঘর এ বাড়িতে, দোতলা-একতলা মিলে গুণে

ফুরোয় না, তবু যেন মনে হ'ত ফুরোচ্ছে না, কিছু লোক উপছে পড়ছে বারান্দায়, কিছু ছাতে।

তারপর আলো নিবতে লাগল এক একটি করে। সবাই বিদায় নিতে শুরু করল। শেষে একদিন মনে হল, সমস্ত বাড়িটা খালি। এই যে বড় বড় থামের যতিচিহ্নিত দীর্ঘ বারান্দা, এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নির্মক্ষিক। কথা বললে ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে, পা ফেললে গম গম করে। মৈত্রেয়ীর কেমন গা ছম-ছম করত। একতলার এক কোণে পড়ে আছে দাস-দাসীরা; দোতলায় শুধু সে, স্বামী আর শাশুড়ি।

শাশুড়ি। এতদিন লোকের ভিড়ে বোঝা যায়নি, এবার তাঁকে আলাদা করে চোখে পড়ল! রূপ? সে বয়সে রূপের কথা অবান্তর। রঙ? এ-পরিবারের সবার রঙই ফর্সা। কিন্তু প্রখর দুটি চোখের ছটা, এর তুলনা মৈত্রেয়ী আজও দেখেনি।

প্রথম দিন চোখ তুলে তাকাতে পারেনি লজ্জায়; পরেও পারল না, ভয়ে। মৈত্রেয়ীর ভিতর থেকে কে যেন বলে দিল, এই মহিলাটি তার চেয়ে সব বিষয়ে বড়—বয়সে, সম্পর্কে, ব্যক্তিত্বে।

ঘৃণার বিষ সেই দিন থেকে ফোঁটা ফোঁটা জমেছে মনে। অবচেতনার গহনে পরাজয় মানাটা ওপরে ভেসে উঠেছে প্রবল বিতৃষ্ণা হয়ে।

অনঙ্গকে মৈত্রেয়ী চেনে, বোঝে। সুখলিপ্সু, লম্পট, ধনী। এই আলস্যলালিত সারমেয়ের শিকল তার কাছেই আছে। কিন্তু যাকে বোঝা যায় না, যার সাপের মণির মত প্রোজ্জ্বল চোখে চোখ পড়লে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত হিম হয়ে আসে, তার সঙ্গে সারাজীবন একসঙ্গে কাটবে কী করে!

এই ভয় মৈত্রেয়ী দেখেছে ঝি-চাকরদের মধ্যেও। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি গল্প-গুজব করে, কিন্তু যে মুহূর্তে মৃণালিনী সমুখে এসে দাঁড়ান, অমনি সব কলরব স্তব্ধ হয়ে যায়, এ ওর মুখের দিকে তাকাতে থাকে। বাটনা যে বাটছিল, তার হাত যায় থেঁতলে; যে তরকারি কুটছিল, তার আঙুল দিয়ে ঝরঝর রক্ত পড়ে।

কাছারি-ঘরে নায়েবমশাই বসে কাজকর্ম দেখেন, প্রজাদের কাছে তিনি সিংহ, কিন্তু গিন্নীমা ডেকে পাঠালে তিনিও যেন জুজুভীতু হয়ে যান। শীর্ণ, সংকুচিত একটুখানি দেহ, পাকাচুলে আঙুল সরে তো মুখে কথা সরে না।

সিন্দুক থেকে ভাঁড়ার ঘরের চাবি, সব একটা আঁচলে। একটিমাত্র প্রবল বিপুল ইচ্ছার ডানা মেলে মৃণালিনী এ বাড়ির সব কিছু ঢেকে রেখেছেন।

এর পরে ইতিহাসটা বিরোধ-সংঘর্ষের ছোট ছোট নুড়িতে আকীর্ণ। প্রতিবারই মৈত্রেয়ী পিছিয়ে এসেছে, প্রতিবারই অক্ষম ক্ষোভে, তীব্র ঘেষে চিত্ত তিক্ত হয়ে গেছে।

কী কাপড় পরবে, তাও মৃণালিনী ঠিক করে দিতেন। রঙে আর রেশমে সঙ সেজে বসে থেকে থেকে হাঁপ ধরে গিয়েছিল; একদিন বুঝি মৈত্রেয়ী বাক্সর তলা থেকে আটপৌরে একটা শাড়ি বার করে পরেছিল। মৃণালিনী চুপ করে চেয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ।

সেদিন মৈত্রেয়ী কঠিন পণ করেছিল। একটা কিছু বলুন না মৃণালিনী, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে। কিন্তু মৃণালিনী কিছু বললেন না, আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

পরদিনই কর্মচারী শহর থেকে ডজন খানেক বর্ণাঢ্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাড়ি নিয়ে এল। মৈত্রেয়ী বলল, 'এ কি!'

মৃণালিনী বললেন, 'ভেবেছিলাম তোমার সব ভাল জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে।'

প্রথমে অপ্রতিভ, পরে অপমানিত বোধ করেছিল মৈত্রেয়ী। কিন্তু দ্বিতীয়দিন আর সেই আটপৌরে শাড়ি অঙ্গে তোলার সাহস হয়নি। পরে অনজ বলেছিল, 'এ-বাড়িতে ওসব কাপড় শুধু ঝি-চাকরে পরে। যারা মনিব, তারা একটু আলাদা-রকম থাকবে বৈ কি, যাতে আলাদা করে চেনা যায়।'

এ-কথাতেও প্রচ্ছন্ন কোন শ্লেষ ছিল কিনা কে জানে ; রূপে বা রঙে তো মৈত্রেয়ীকে আলাদা করে চেনা যাবে না, জবরজঙ পোশাকে যদি-বা যায়।

আস্তে আস্তে অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মাকে তুমি পছন্দ কর না ?'

মৈত্রেয়ী বলেছিল, 'আমার করা-না-করাতে কী এসে যায় ! তোমার মা করেন কিনা সেই আমার ভাবনা।'

মৃণালিনীর মুখের দিকে সাহস ক'রে তাকিয়ে কোন কোন দিন মৈত্রেয়ী এই প্রশ্নের জবাব খুঁজেছে, পায়নি। আরও অস্বস্তি বেড়েছে তাতে। তুষ্ট থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, রুষ্ট হলে সাবধান থাকা চলে, কিন্তু যার মুখে মনোভাবের একটি রেখাও ফুটে ওঠে না, তার মন মৈত্রেয়ী যুগিয়ে চলে কি করে !

কিছুদিন পরেই নীরদের কাছ থেকে টাকার তাগাদা এল। মৈত্রেয়ীর কোন সাড়াশব্দ নেই কেন ! নাকি স্থূল সুখের স্বাদ পেয়েই সে ভুলে গেছে পার্টির কথা, তাদের সংকল্পের কথা। 'তৃপ্তির তাকিয়ায় মুখ ডুবিয়ে তুমি যখন শুয়ে আছ মৈত্রেয়ী, আমরা তখন ফিরছি পথে পথে। স্নান নেই, খাওয়া নেই, পেছনে পুলিশ, সামনে কাঁটাপথ, অন্ধকার। ঠিকানা জানি, নিশানা নেই।'

টাকার কথা শুনে অনঙ্গর মুখে হাসি খেলে গেল।

—'আবার ? কিন্তু এখানে টাকা কোথায় পাব মৈত্রেয়ী ? সব টাকা মার হাতে। তাঁর কাছে চাও।'

কালো হয়ে গেল মৈত্রেয়ীর মুখ।

—'কেন হাত পাতব ওঁর কাছে ? টাকা তো তোমার।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অনঙ্গ গম্ভীর সুরে বলল, "ভুল ধারণা তোমার। সব মা'র। বাবা যখন মারা যান, আমি তখন কোলের শিশু। মা সেই থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পত্তিও লালন করছেন। সব যদি তখন নিজহাতে মা তুলে না নিতেন, তবে এই যে এত দেখছ—আরাম, আয়াস, বিলাস—সব কোথায় থাকত !'

মৈত্রেয়ী বলতে চেয়েছিল, 'তা হলে তোমাকে কষ্ট-[illegible], খেটে খেয়ে বাঁচতে হত। মানুষ হতে।' কঠিন কথাটা জিহ্বাগ্রে [illegible]ল, বেরুল না। কেন না, লাভ নেই। এ.অনঙ্গ সে নয় যে বেপরোয়া, তরুণী একটি মেয়েকে নিয়ে বিনাভূমিকায় দরজা ভেজিয়ে দিতে পারে। এ সম্পূর্ণ-ভাবে মায়ের কাছে আত্মবিক্রীত।'

অনঙ্গ বলল, 'মার কাছে কৃতজ্ঞ হতে শেখো। দেখছ না, কী অমানুষিক পরিশ্রম মা করছেন আমাদের সংসারের জন্যে, আমাদের শান্তি, আমাদের ভালর জন্যে?'

মৈত্রেয়ী দেখেছে বৈ কি।

অনঙ্গ যখন পায়রা পোষে, ঘুড়ি ওড়ায়, বাইচ খেলে, জুড়ি হাঁকায়, তাস খেলে, পয়সা ওড়ায়, মৃণালিনী তখন চশমাটি নাকের ডগায় এঁটে হিসাবের খাতা দেখেন। সকালে নমোনমো করে কখন পূজো সারেন, মৈত্রেয়ী টেরও পায় না। জেগে উঠে রোজই দেখে, মৃণালিনী ঘেরা বারান্দার কোণে নির্দিষ্ট একটু জায়গায় কাঠের ডেস্কোর সমুখে বসে তন্ময় হয়ে খাতাপত্র পড়ছেন। আদায় উশুলের কথা ওঁর জানা, কোন খাজনা যদি মকুব হয়, তাও। এর উপর মামলা আছে, মোকর্দমা আছে। নিজে উকিল ডাকিয়ে পরামর্শ করেন, কী ভাবে কী করতে হবে, উপদেশ দেন।

মৃণালিনী বললেন, 'টাকা? তুমি এত টাকা দিয়ে কী করবে বৌমা?'

মৈত্রেয়ী বলল, 'দরকার আছে।'

—'তার মানে, বলতে চাও না? কিন্তু এত টাকা একসঙ্গে পাওয়া যাবে না বৌমা। এবার আদায় ভাল হয়নি, তার ওপর সামনে বাসন্তী পূজো। অনেক খরচের ধাক্কা। বলি পড়বে, বাজি পুড়বে, যাত্রা-গান হবে, এমন কি'—একটু থেমে বললে, 'অনঙ্গ বাইজীও আনাতে পারে।'

শেষ কথাটায় মৈত্রেয়ী পাংশু হলে গেল।

—'ওর এই সব খেয়ালের আপনি প্রশ্রয় দেন মা?'

মৃণালিনী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। পরে ধীরে ধীরে বললেন, 'খেয়াল তো ওর একার নয়, বৌমা। তোমার শ্বশুরের পিতামহের আমল থেকে এ চলে আসছে। তুমি বুঝবে না। তা ছাড়া জেনে রাখ, এ-সব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে খুঁতখুঁত করে সাধারণ ঘরে। বড় ঘরে এ-সবে দোষ ধরে না।'

জবাব দিতেও মৈত্রেয়ীর প্রবৃত্তি হয়নি। ঘৃণার সাপটা আরেকবার সমস্ত সত্তাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বিষাক্ত করে দিয়েছে।

সেদিন বিকেলেই একটা অসমসাহসিক কাজ করল মৈত্রেয়ী। খাস ঝিকে দিয়ে ডেকে পাঠাল নায়েবকে। কয়েকটা গহনা খুলে দিয়ে বলল, 'এগুলো পাঠিয়ে দিন। এই ঠিকানা।'

নায়েব করজোড়ে বললেন 'আর যা ইচ্ছে আদেশ করুন, কিন্তু এ-কাজটি পারব না। মা শুনলে বড় রাগ করবেন।'

মা, মা, মা। নিজেকে মৈত্রেয়ী আর ধরে রাখতে পারেনি, প্রায় চেঁচিয়ে বলেছে, 'আমি বুঝি কেউ নই?'

'কেউ নও? ছি, বৌমা, তুমিই তো সব। সব তোমারই।'

মৈত্রেয়ীর মুখ শাদা হয়ে গেছে। পেছন ফিরে তাকাতেও সাহস হয়নি। মৃণালিনী আবার বললেন, 'তবে কি জান, যে কটা দিন আমি আছি, সে কটা দিন তুমি আর নিচে না নামলে, কাছারি-ঘরে না-ই বা এলে। সব ঝুঁকি আমাকে পোহাতে দাও। আমি হু'চোখ বুজলে সব তোমারই হবে।'

হু'চোখ বুজলে? কবে, কবে, কবে? সেদিন থেকে প্রতিদিন বুঝি শাশুড়ির মৃত্যুকামনা করেছে মৈত্রেয়ী, ওঁর মুক্তি তিথিটির অপেক্ষা করছে।

আরেকবার শুধু মৈত্রেয়ী মৃণালিনীর কথা অমান্য করেছিল। সেবার অজন্মা, ঘরে ঘরে কান্না, প্রতি সকালে কাছারি-ঘরে প্রজাদের ভিড়—খাজনা মকুবের আরজি। কিন্তু এদিকে হাতের টাকায় টান পড়েছে; মৃণালিনীর কড়া হুকুম—এক পয়সাও রেহাই পাবে না কেউ। ধন্না দিয়ে

লোকগুলো বসে থাকে বেলা দুটো তিনটে অবধি, পেট জলে পুড়ে খাক হয়।

একদিন মৈত্রেয়ী খাস ঝি তরঙ্গকে বলল, 'একটা কাজ কর না। ওদের দুটো করে বাতাসা আর এক ঘটি জল দিয়ে আয়। কখন থেকে সব বসে আছে!'

তরঙ্গ বলল, 'এমন কথা মুখেও এনো না বৌরাণী। মার হুকুম জানো না? আজ একটা লোককে ওরা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কী মারটাই মারলে! এখনও গোঙাচ্ছে। শোননি?'

আর স্থির থাকতে পারল না মৈত্রেয়ী—মৃণালিনীর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলল, 'একটা লোককে আজ বেঁধে রেখে মেরেছেন আপনারা?'

মৃণালিনী মামলার নথি পড়ছিলেন। চশমা খুলে নিয়ে বললেন, 'কেন?'

—'কেন, তাই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি মা। একাজ কেন করছেন আপনারা? অত্যাচার এমনিতেই তো যথেষ্ট হচ্ছে। আবার বেঁধে মারা কেন!'

আশ্চর্য, মৃণালিনী রাগ করলেন না। নথিটা একপাশে সরিয়ে রেখে হাসলেন।

—'বুঝতে তোমার একটু সময় লাগবে বৈ কি, বৌমা। আর, এ কীই-বা অত্যাচার দেখছ! যেখানে বসে আছ, সেখানে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অনেক ঘটনা ঘটেছে। বাগানের জবা গাছটা দেখতে পাচ্ছ, যেটা থেকে রোজ পুজোর ফুল তুলি? ওর নিচে একবার একটা আধমরা লোককে টেনে নিয়ে কবর দিয়েছিলেন তোমার শ্বশুর!'

মৈত্রেয়ী আপাদমস্তক শিউরে উঠল, মৃণালিনী লক্ষ্য করলেন। বললেন, 'গর্তে ফেলে দেওয়া হল লোকটাকে, মাটি চাপা দিয়ে ফুলগাছ লাগানো হল। কী টকটকে লাল জবা ফুটছে দেখতে পাওনা?'

মনে মনে সেদিন কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিল মৈত্রেয়ী। আর না।

আর কোন কথা বলতে আসবে না। শুধু অপেক্ষা করে থাকবে। তারপর, দিন এলে টুকরো টুকরো প্রতিটি ইট খসিয়ে দেবে এই পাপ-পুরীর। ঘুচিয়ে দেবে এই বাইজী নাচানো আর পায়রা ওড়ানো। বলিদান আর বাজি পোড়ানো বন্ধ করে সেই টাকায় খুলবে ইস্কুল, কাটাবে পুকুর, রাস্তা তৈরী করিয়ে দেবে।

ছেঁড়া স্মৃতির কাঁথা রিপু করতে গিয়ে বারবার ছুঁচ ফুটছে, তবু মৈত্রেয়ী ছাড়ছে না। এও একটা নেশার মত। বিষপানের ক্রিয়া কি এতক্ষণ থাকে!

এর পরের ক'বছর শুধু বারকয়েক আঁতুড়ঘরে যাওয়া-আসার ইতিহাস। এল, কিন্তু থাকল না কেউ। প্রথমটা গেল আঁতুড়েই, পরেরটা বুঝি মাস কয়েক বেঁচেছিল। তার পরেরটা হয়ে মোটে দু' ঘণ্টা ছিল। একেবারে শেষেরটা নষ্ট হয়ে গেল পেটেই।

সমস্ত শরীর রক্তশূন্য, দাঁড়াতে গেলে পা কাঁপে। মাথা আঁচড়াতে গেলে চিরুণির আগে চুল উঠে আসে। অনঙ্গর পায়ে হাত দিয়ে মৈত্রেয়ী বলল, 'এবার রেহাই দাও, আর না।'

অনঙ্গ বলল, 'তা কি হয়! মা যে আজও বেঁচে আছেন, সে শুধু নাতির মুখ দেখবেন বলে। আমাদের শুধু কর্তব্য করে যাওয়া।'

মা! এখানেও মা! মৈত্রেয়ীর শরীরের সব কটা পেশী সঙ্কুচিত হয়ে গেল, শুকনো গলায় স্বর ফুটল না।

এর কিছুদিন পরে মৈত্রেয়ী যা ভয় করেছিল তাই ঘটল। চিঠি লিখে লিখে নীরদ জবাব পায়নি, এবার নিজেই এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'পুলিশ পিছনে আছে, এক্ষুণি পালাতে হবে। তার আগে তুমি কিছু টাকা দাও তো মৈত্রেয়ী।'

'টাকা তো আমার কাছে নেই।'

'তবে তোমাদের সিন্দুকের চাবিটা দাও।'

'তাও নেই। সব শাশুড়ির কাছে

বলতে বলতে ঝর-ঝর কেঁদে ফেলল মৈত্রেয়ী। আরেকদিন নীরদের কাছে যেমন কেঁদেছিল। সব খুলে বলল, একে একে।

নীরদ মৈত্রেয়ীর একখানি হাত ধরল। 'তবে তুমি এখানে পড়ে আছ কেন? যে জন্যে আসা, তাই যখন হল না, চলে এস আমার সঙ্গে।'

মৈত্রেয়ী হাত ছাড়িয়ে নিল।

—'এখন হয় না নীরদদা।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে নীরদ বললে, 'কেন?'

মৈত্রেয়ী মাথা নিঁচু করল, বলল, 'বাধা আছে। আমাকে দেখে বুঝতে পারছ না?'

নীরদ কী বুঝল সেই জানে। কুড়িয়ে নিল হাতের লাঠিটা, শুষ্ককণ্ঠে বলল, 'চলি।'

—'লোকটা কে বৌমা?' নীরদ নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মৃণালিনী।

—'আমার দাদা।'

—'সে তো বুঝলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, কেমন দাদা? একটু খটকা লাগল কিনা। ঘরের বৌকে বের হয়ে যাবার ফুসমন্তর দেয়, এ-তো যেমন তেমন দাদা নয়!'

মাথা নীচু করে মৈত্রেয়ী দাঁড়িয়ে রইল। একটা কথাও মুখে সরল না।

মৃণালিনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, যেন জবাবের অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু তুমি কেন এমন কাজ করলে বৌমা? নিজেও সুখী হলে না, আমার ছেলেটাকেও হতে দিলে না?'

সেই একবার মৈত্রেয়ীর কপালের শিরা ফুলে উঠেছিল, কঠিন হয়েছিল হাতের আঙুল। লোভ হয়েছিল চিরদিনের মত মৃণালিনীর কণ্ঠ শুদ্ধ করে দেয়।

পারেনি। আঙুলগুলো আবার শিথিল হয়ে গেছে, ইচ্ছা আর সাহসের মাঝখানে ফাঁকটুকু ভরেনি।

মৃণালিনীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল সেবার তীর্থ থেকে ফিরে

এসে। রোজই জর, অল্প অল্প সর্দিকাশি। এক এক রাত্রে এমন টানাটানি গেছে যে, মৈত্রেয়ীর মনে হয়েছে কাল সকালে হয়ত আর মৃণালিনী উঠতে পারবেন না।

কিন্তু আশ্চর্য মনের জোর মানুষটার। রোজ সকালে সূর্য-প্রণাম করেই মৈত্রেয়ীর চোখে পড়েছে বারান্দায় অভ্যস্ত স্থানটিতে শাশুড়ি, সেই পরিচিত ভঙ্গী।

তবু মৃত্যু হল।

মৃণালিনী মরতে চাননি, শেষ পর্যন্ত শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন সংসারের চাবি, তবু শেষ দিনটিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না।

এই তো সেদিনের কথা, মৈত্রেয়ীর স্পষ্ট মনে আছে। সেদিনও জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যকে দেখবার পরই দেখেছিল শাশুড়িকে। নিবিষ্ট তদ্গত মূর্তি। কি একটা দরকার ছিল। ডাকল, 'মা।' জবাব না পেয়ে কাছে গেল। এবারও সাড়া নেই। মনে হল মাথাটা যেন দেয়ালে এলিয়ে পড়েছে। ঠেলতেই নথিপত্র খসে পড়ল।

মৈত্রেয়ী আর্ত একটা চীৎকার করেছিল, মনে আছে। সবাই ছুটে এসেছিল, সবার আগে অনঙ্গ।

অনঙ্গ কেঁদেছিল। রীতি-রক্ষার্থ রুমালে অল্প অল্প চোখ-মোছা নয়, শিশুর মত, আষাঢ়-আকাশের মত।

কোনক্রমে সেখান থেকে দু'হাতে মুখ ঢেকে মৈত্রেয়ী শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। বড় লজ্জা। এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলতে না পারার লজ্জা।

আর বিস্ময়। প্রতীক্ষিত মুক্তির দিনটি এসে গেছে, এই উপলব্ধির টলমল বিস্ময়। কিন্তু তখন ভাবনার সময় ছিল না। অনঙ্গ অপ্রকৃতিস্থের মত পড়ে আছে। সৎকারের বন্দোবস্ত মৈত্রেয়ীকেই করতে হবে।

শোকাচ্ছন্ন আরও কটা দিন কাটল। নায়েব মশায় একদিন সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—'কী চান?' মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করল।

—'খাতাটা দেখাতে এনেছি।'

—'দেখাতে এনেছেন? কিন্তু এখানে কেন? ওঁর কাছে নিয়ে যান।'

নায়েব হাসলেন। 'বাবু আবার কবে এসব দেখেন? উনিই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ওঁর মন ভাল নেই। তার ওপর অশৌচের ক্লেশ আছে।'

নায়েব বললেন, 'আমি বুঝিয়ে দেব। তা ছাড়া আপনি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। এ রপ্ত হতে আপনার কতদিন লাগবে!'

ডালা ধরে খুলতে দু'জন লোক লাগে যে সিন্দুক, তার চাবি পেয়েছে মৈত্রেয়ী; আর একশোটা সারি সারি ঘরের, যার দরজা খোলা হয় না কখনও, কবাটের কবজা জং ধরে চৌকাটে সেঁটে গেছে।

দিন এসেচে। এবার আস্তাবলের টাটু ঘোড়াগুলো ছেড়ে দেবে মৈত্রেয়ী, শখের কবুতরগুলোকে একে একে আকাশে উড়িয়ে দেবে। দীর্ঘ, সামন্ত-রাত্রি-প্রভাত হয়েছে।

নায়েবমশায় রোজ আসছেন। বিষয়-রহস্য মৈত্রেয়ী বুঝতে পারছে ক্রমে ক্রমে। কত টাকা আদায় হয় কখন, কত যায় সরকারে, কোন্ ফসল কি মাসের।

খাতা থেকে মুখ তুলে মৈত্রেয়ী একবার বলে উঠল, 'এবারে আদায় ভাল হয়নি, না নায়েবমশায়?'

নায়েব বললেন, 'না।'

—'কেন?'

—'দিনকাল বদলে গেছে বৌরাণী। প্রজাদের জোর বেড়েছে। নজরাণা উঠে যাবার দাখিল। খাজনা দেয় সেও যেন ওদের দয়া। অথচ সামনে মস্ত বড় খরচের ধাক্কা আছে।'

—'কিসের?'

'কেন, মার শ্রাদ্ধক্রিয়া। মহা পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন, তাঁর শেষ কাজে খরচ তো একটু ঢালা হাতেই করতে হবে, বৌরাণী। নানাস্থান থেকে পণ্ডিতেরা আসবেন। বিশ গ্রামের লোক খাবে।'

—'কত টাকা খরচ হবে মনে করেন ?'

নায়েব বললেন, 'অন্ততঃ হাজার দশেক।'

মৈত্রেয়ী তখন কিছু বললনা। রেল স্টেশন থেকে গ্রাম অবধি একটা পাকা রাস্তা তৈরী করার পরামর্শ কিছুদিন থেকে করছিল নায়েবের সঙ্গে! সন্ধ্যার পর নায়েবকে ডাকিয়ে বলল, 'রাস্তার কাজ আপাতত বন্ধ থাকুক। আপনি ডিস্ট্রিক্টবোর্ডকে সেইমত একটা চিঠি লিখে দিন।'

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর আবার ডাক পড়ল নায়েবের।

—'আমি একটা স্কুল খুলতে চাই, নায়েবমশায়।'

—'কি ইস্কুল ?

—'মেয়েদের, আপাতত মাইনর, তাতে স্বাবলম্বী হবার বৃত্তিগুলোও শেখান হবে।'

নায়েব মাথা চুলকে বললেন, 'সংকল্প তো ভালই। কিন্তু বৌরাণী—'

—'কী ?'

—'খরচের কথা ভেবেছেন ?'

—'আন্দাজে কতকটা ঠিক করেছি। কেন, বাধা কিছু আছে ?'

—'আছে বই কি' নায়েব বুঝিয়ে বললেন, 'তহবিল প্রায় খালি, নগদ টাকা শ্রাদ্ধ-শান্তিতেই ফুরিয়ে এসেছে। খুব শীগ্‌গির বিশেষ কিছু আদায় হবার সম্ভাবনাও কম।'

—'তা হলে ?'

নায়েব কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'সাহস দেন তো আপনাকে একটা কথা বলি, বৌরাণী। এসব কাজ ভাল, কিন্তু শুভ কাজের জন্যে সময় লাগে। ভাল ভাল সংকল্প আপাতত কিছুকাল স্থগিত রাখুন। বড় খারাপ দিনকাল, আরও খারাপ দিন আসছে। জমিদারী-প্রথারই আয়ু আর কতদিন, বলা যায় না। ইংরেজ শুনছি চলে যাবে। স্বদেশীদের হাতে ক্ষমতা এলে ওরা কী করে, ঠিক নেই!'

মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে বাধা না পেয়ে নায়েবের আর একটু সাহস বাড়ল, 'দিনকাল মার আমলেও খারাপ ছিল, জ্ঞাতিশত্রু, প্রজাশত্রু।

কিন্তু তিনি ছিলেন বিচক্ষণ মানুষ, হিসেব করে চলে চলে এই সম্পত্তি ক্ষয়ে যেতে তো দেননি, বরং তিলে তিলে বাড়িয়ে গেছেন। কার জন্যে বৌরাণী ?—দাদাবাবুর জন্যে, আপনার জন্যে। আপনিও তেমনি—' পাশে দোলনায় মৈত্রেয়ীর তিনমাসের শিশুটির দিকে আঙুল দেখিয়ে নায়েব বললেন, 'আপনিও তেমনি ওর কথা ভেবে সব কাজ করুন, বৌরাণী। ঈশ্বর না করুন, যদি একটা বড় গোছের ওলট-পালট কিছু হয়, তখন এই শিশুটির ভবিষ্যৎ কী, ভেবে দেখেছেন ?'

দেখেনি, দেখার কথা ভাবেইনি। ভাবনা করার মত মনের অবস্থাও তখন নয় মৈত্রেয়ীর। মাথা ঘুরছিল। নায়েবকে শুধু বলল, 'আপনি এবার যান।'

পরদিনই নীরদের চিঠি এল। মৃণালিনীর মৃত্যুর কথা জেনেছে কি-করে। এবারে তো কোন বাধা নেই। সুতরাং—

মৈত্রেয়ী জানে। টাকা। টাকা চাই। ইংরেজরাজ টলমল। কংগ্রেসী আপোষ-আলোচনার নীতিতে নীরদদের দলের বিশ্বাস নেই। সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছে তলে তলে। এবার চরম আঘাত। কিন্তু তার জন্যে—

বাকিটুকু না পড়েই মৈত্রেয়ী বলে দিতে পারে, টাকা চাই।

কিন্তু কোথায় টাকা ? তহবিল খালি, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। যা কিছু আছে, সেইটুকুই ধরে রাখতে হবে সযত্নে, আর কিছু না হোক, কোলের শিশুটির মুখ চেয়ে।

মৈত্রেয়ী লিখল নীরদকে। প্রথমে ক্ষমা চেয়ে, অক্ষমতা জানিয়ে। একটু উপদেশও জুড়ে দিল শেষে। ইংরেজবিতাড়নের জন্যে আর বড় রকমের আয়োজনের দরকার নেই, ইংরেজ আপনা থেকেই যাবে। তার চেয়ে, এখনও সময় আছে, তুমি সুস্থ হও, সংসারী হও, নীরদদা।

চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়ে মৈত্রেয়ী মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। ভাল জবাব হয়েছে।

সেই হাসি বেশীক্ষণ রইল না কিন্তু। লিখে, ভাঁজ করে মৈত্রেয়ী উঠে

এসেছিল টেবিলের কাছে, খাম বের করতে হবে। আবক্ষ প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়। সোজাসুজি তাকাতেই চোখে পড়ল।

এত ভয় মানুষ বুঝি মৃত্যুর মুখোমুখি পড়ে গিয়েও পায়না। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শিউরে উঠেছিল, নিমেষে নীরক্ত হয়েছিল মুখ।

তবু বিশ্বাস হয়নি। মিলিয়ে দেখতেই বুঝি তাকিয়েছে দেয়ালের দিকে, যেখানে ফুলের মালার ফাঁস-পরানো, ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি ঝুলছে। মৃণালিনী। দশবারো বছর আগে তোলা ছবি, কিন্তু ব্যঙ্গবিচিত্র হাসিটুকু এখনও অবিকৃত। মৈত্রেয়ী একবার তাকালো সেই ছবির দিকে, একবার আয়নায়। তারপর আর তাকাতে পারল না।

না, আর ভুল নেই। আয়নায় তো সে নয়, আরেকজন। চিনতে পেরে মৈত্রেয়ীর বুকের ভেতরটা যেন বরফ জমে স্তব্ধ হয়ে গেল। এতকাল ধরে সঞ্চিত ঘৃণা কি শেষে এই রূপ নিল।

তারপর কী করেছে মনে নেই।

খুট করে শব্দ হল। মৈত্রেয়ী চোখ মেলল। সকালের প্রথম আলো পড়েছে ঘরে। অনঙ্গমোহন শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে।

—'এখন কেমন আছ?'

—'একটু ভাল।' মৈত্রেয়ী ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল।

একবাটি গরম দুধ নিজ হাতে এনেছে অনঙ্গমোহন। ক' ফোঁটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে ফেল।'

একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন বোধ করছ?'

মৈত্রেয়ী বালিশে ফের মাথা রেখেছিল, ইশারায় বলল, ভাল।

অনঙ্গমোহন বসল শিয়রের কাছে, মৈত্রেয়ীর একখানা শিথিল হাত তুলে নিল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নীচু গলায় বলল, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। কাল রাত্তিরে এঘর থেকে যখন চলে যাই, একটা কথা বলেছিলে, আত্মহত্যা নয়, হত্যার চেষ্টা। একথার অর্থ কী, মৈত্রেয়ী? কে তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল?'

অনেকক্ষণ শূন্যচোখে চেয়ে থেকে মৈত্রেয়ী বলল, ‘কোন অর্থ নেই। ভুল বকেছিলুম।’

—‘ভুল?’

মৈত্রেয়ী আস্তে আস্তে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ভুল বইকি। কিন্তু অনঙ্গ ভুল নিয়েই থাকুক। ঠিক কথাটা বোঝাবার সাধ্য মৈত্রেয়ীর নেই। আর, বললেও অনঙ্গ কি বিশ্বাস করবে, মৈত্রেয়ী আত্মহত্যা করতে চায়নি, বিষ খেয়ে শেষ করতে চেয়েছিল তাকে, নিজের মধ্যে আজ যাকে দেখতে পেয়েছে।

সহমরণ

কার্ডটা বারকয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। আর যাই হোক, নিবেদিতা দেবীর রুচি নেই একথা লোকে বলবে না। মসৃণ, ধবধবে কার্ড, আইভরি ফিনিশ। নয়নারাম কয়েকটা বাহুল্যবর্জিত অক্ষরে ছাপা নিমন্ত্রণলিপি।

শুধু ছাপার অক্ষরকে নিবেদিতা দেবীর আবার বিশ্বাস হয়নি, কার্ডের বর্ডার দিয়ে গোটা গোটা হরফে লিখে দিয়েছেন 'অবিশ্যি আসবেন কিন্তু। আগের বার ফাঁকি দিয়েছিলেন, ভুলিনি। এবারে কোন এনগেজমেণ্টের ওজর শুনব না। অনুপস্থিতির ত্রুটি আপীলেও মার্জনা হবে না।'

এই তো সেদিন চায়ের পার্টি দিয়েছিলেন নিবেদিতা দেবী, এরই মধ্যে আবার?

আর এস ভি পি নামক একটা ব্যাপার আছে, অপ্রীতিকর কিন্তু অবশ্যকৃত্য। সেটা ফোনেই সারবো স্থির করলুম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। একটু পরেই ও-প্রান্ত থেকে সাড়া এলো: 'হ্যালো।'

নিবেদিতা দেবীর গলা। সবিনয়ে নিজের নাম ঘোষণা করে বললুম, 'কার্ড পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ ভোজ কেন, কী ব্যাপার বলুন তো?'

কাঁচের শার্সির ওপর হালকা হাওয়া হাত বুলিয়ে গেল, নিবেদিতা দেবী এমন গলায় হাসলেন। '—আবার ফাঁকি দেবার মতলব খুঁজছেন না তো?'

বললাম, 'শনিবার একটা কাজ ছিল বটে। তবে আপনারটা যদি জরুরিতর হয়, সেটা খারিজ করতে পারি।'

'তাই করুন তবে।' নিবেদিতা আবদারের গলায় বললেন, 'প্রায়রিটি আমার।'

এর পরেও 'না' বলতে পারি, এমন বর্বরতা বা মনের জোর কোনটাই আমার নেই। কথা দিলুম, যাবো।

কথা দিলুম বটে, কিন্তু অস্বস্তি গেল না। এ অস্বস্তি নেহাৎ স্নায়বিক নয়, এর কিছুটা অনভ্যাসের। মেয়েদের মনের কথা জানি না, তবু এর সঙ্গে তুলনা হয় বাসরে যেতে নব-বধূর সংকোচের। সে ভীরুতা তবু মধুর, তাতে থরো থরো প্রত্যাশা মেশানো আছে। কিন্তু আমার সঙ্কোচ নি-খাদ।

ডিনার-লাঞ্চ ইত্যাদি যাঁদের কাছে লাঞ্ছনার নামান্তরমাত্র তাঁরা নিশ্চয় ঈর্ষার সঙ্গে এ সব ব্যাপারে অপরের নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছেন। অনেকেই খোলা গলায় গল্প করে, হাসি ঠাট্টাও চলে, আসর জমে। আর এদিকে অনভ্যাসের এঁটো ঠোঁট চড় চড় করছে, কতক্ষণে তোয়ালের মুখ মুছে পালানো যাবে, সেই অপেক্ষা।

যাই হোক, কথা যখন দিয়েছি তখন বৃথা এ ক্রন্দন। নিমন্ত্রণ, দেখলুম, আরো অনেকেই পেয়েছেন। নিবেদিতা দেবী কাউকেই বড়ো বাদ দেননি। শিল্পী প্রভাকর দেবের সংস্পর্শে একবারো যারা এসেছে, খুঁজে খুঁজে তাদের বার করেছেন ঠিক।

আর্ট ক্রিটিক সমাদ্দার দেখা হতেই বললে, 'ওহে কার্ড পেয়েছ তো।'

বললুম, 'পেয়েছি। কিন্তু কারণ কী বুঝিনি।'

সমাদ্দার বললে, 'বোঝবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও নেই। নিবেদিতা দেবী তো অকারণ পুলকেও অহ্বান করতে পারেন।'

রসিকতাটা ঈষৎ স্থূল। ভালো লাগল না। প্রভাকর দেব আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন। তাঁরই স্ত্রী নিবেদিতা দেবী। তাঁকেও সমীহ করি।

বললাম, 'হয়ত প্রভাকর দেবের অপ্রকাশিত কিছু ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'অপ্রকাশিত ছবি?' সমাদ্দার হাসল। '—ওই ট্রিকটার বয়স কিছু বেশি হয়ে গেছে, ওতে আর চলে না। লোকে অবিশ্বাস করে। জীবদ্দশায় যে সব প্রতিষ্ঠাবান লেখক কিম্বা শিল্পী এঁকে কূল পাননি,

বিস্তর প্রার্থীকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মৃত্যুর ঠিক পরেই এত অপ্রকাশিত রচনা আর ছবি আসে কোথা থেকে বলতে পারো ?'

সমাদ্দার কিছু উত্তেজিত। ওকে আর বেশি ঘাঁটানো ঠিক না। বললাম, 'চলি। রবিবার দুপুরে সাইপ্রেস রো-তে দেখা হচ্ছে।'

সমাদ্দার বললে, 'নিশ্চয়। আর্ট সমালোচনা করি বটে, কিন্তু অকৃত্রিম ভালোবাসি ভোজ্য বস্তু। চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়, নিবেদিতা দেবী কোনটাই বাদ দেবেন না, জানি।'

যে দেশে খ্যাতির চূড়ায় উঠেও একজন প্রধান কবিকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাতে হয়েছিল, সেই দেশে শিল্পী প্রভাকর দেবের সমাদর কিছু বিস্ময়কর বৈকি। আর শুধু হেমগন্ধহীন প্রেম নয়, জীবনের শেষ ক'টা বছর প্রভাকর অর্থোপার্জনও মন্দ করেনি। কৃতী কবি বা কথাসাহিত্যিকের তুলনায় চিত্রশিল্পীরা এক হিসেবে সৌভাগ্যবান। দেশান্তরে স্বীকৃতি পেতে হলে শ্রেষ্ঠ কবিকেও ভাষান্তর করণের অপেক্ষায় থাকতে হয়। কিন্তু ছবির ভাষা সর্বত্র এক,—প্রদেশ, দেশের বেড়া অনায়াসে ডিঙিয়ে যেতে পারে।

প্রতি বছরই শীতকালে প্রভাকরের ছবির একটা প্রদর্শনী হ'ত। হিসাব নিকাশের সময় দেখা যেতো, সে ছবির একটা মোটা অংশ কিনেছে বিদেশীরা। তাদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু ট্যুরিস্টদের সংখ্যাও কম নয়। মার্কিন আছে, সুইস আছে, ফরাসী আছে। অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি কী পেয়েছে ওরা প্রভাকরের ছবিতে। ছ' উইকে গোটা ইণ্ডিয়ায় ফ্লাইং টুর দেবে, ওদের কি এখন আছে ছবি বোঝার মন, ভগবান জানেন আছে কিনা, প্রভাকরের ছবি-তো কাটে হু-হু করে। বুঝুক না-ই বুঝুক, ভালো লাগুক না-ই লাগুক, তাই বলে ছবি কিনবে না ? ইণ্ডিয়া দেখতে এসেছে, স্নেক্স্ আর ইয়োগী ছাড়াও যে অনেক কিছু পাওয়া যায়, প্রিয়তমার কাছে তার নিদর্শন নিয়ে যেতে হবে না ?

যখনকার কথা বলছি তখন প্রভাকরের খ্যাতির দ্বিপ্রহর। এই প্রভাকরকেই সর্বসাধারণ চিনেছিল। আর অসাধারণ যাঁরা, অর্থাৎ দেশী রাজা-মহারাজা, নাইট, জমিদার, তাঁরাও এই প্রভাকরের পৃষ্ঠ-পোষণ করেছেন। শেষের দিকে এমন হয়েছে, পট হোক, ঘট হোক, প্রভাকর তুলি ছোঁয়ালেই সোনা। তার মূল্য একশো থেকে হাজার, যা-খুশি।

এই প্রভাকরের সাধনার প্রথম পর্ব কেটেছে আহিরিটোলার অখ্যাত অন্ধ গলিতে, লোক-লোচনের আড়ালে। তার কিছু কিছু বর্ণনা প্রভাকরের মুখেই শুনেছি, অনেক পরে।

থিয়েটারের সিন আঁকতো প্রভাকর। লোকে নটশেখরের বক্তৃতায় হাততালি দিয়েছে, কিন্তু পেছনের পটের দিকে চেয়ে দেখছে ক'জন। গভীর অরণ্যে দুর্যোগের দৃশ্যে, যেখানে প্রধানা অভিনেত্রী পথ হারিয়ে করুণ গান ধরেছেন.—সে সুর শুনে পাষাণও গলে, দর্শকদের তো কথাই নেই—ঘন ঘন হাততালি পড়েছে ; কিন্তু কেউ কি একবার ভেবেছে বনের দৃশ্যপট যদি এমন নিপুণ হাতে আঁকা না হ'ত, এমন ছমছমে অন্ধকার যদি তুলির আঁচড়ে না ফুটতো তবে গান কি জমতো, না চোখে আসত জল? ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের দৃশ্য তারিফ করেছে সবাই, কিন্তু কারুর একবার মনে হয়নি এর মধ্যে সীন-আঁকার ভেল্‌কিও অনেকখানি।

প্রভাকরের মন উঠল না। থিয়েটারের কাজ ছেড়ে দিলে। শুরু হ'ল আরেক যুগ। ইতিমধ্যে থিয়েটারের রঙ আর পট থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে আপন খেয়ালে প্রভাকর কিছু কিছু ছবি এঁকেছিল। কিন্তু তখন শক্তি কম, কল্পনার দৌড়-ও বেশি না। নামজাদা শিল্পীদের ছবি সামনে রেখে আঁকা; সে সব ছবিতে মৌলিকতা ছিল না। মূলের বিকৃত প্রতিরূপায়ণের কেউ আদর করলে না।

সম্পাদকরা একবার দেখেই পত্রপাঠ ফেরৎ দিয়েছেন, 'না মশাই, এ চলবে না। এ কি ছবি না কাগজের ওপর রঙ নিয়ে ছেলেখেলা।'

যাঁরা ভদ্রতর, তাঁরা সহানুভূতির সুরে বলেছেন. 'কী করি মশাই, কাগজ চলে না। দপ্তরীর পাওনা মেটাতে পারি না, লেখকদের পারতপক্ষে দিই না এক পয়সা, এর ওপরে আবার ছবি ছাপাবার টাকা কোথায় পাই বলুন। আপনার আবার তিনরঙা ছবি, মেলা টাকার ধাক্কা। আমাদের প্রধান কাজ এখন জনশিক্ষা। দেশের লোককে শিল্পসচেতন করে তুলতে হবে,—তারা ছবি দেখবে, কাব্য পড়বে, নৃত্যে রস পাবে, সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।'

প্রভাকর অবশ্য অতোদিন অপেক্ষা করতে পারেনি। ভাগ্য প্রসন্ন, শস্তা দামে কিছু কিছু ছবি সেই সময়েই ক্যালেণ্ডার-ওয়ালাদের বিক্রী করতে পেরেছিল। 'শতেক গোপিনী পরিবৃত কানু,', আর 'রামের রাজ্যাভিষেকের' চটকদার রঙ-বেরঙের ছবি।

সেই বর্ণাঢ্যতার মধ্যে যখন কোন নামকরা শিল্পরসিক রসের সন্ধান পেলেন, প্রভাকরের সেদিন থেকে সুদিন শুরু। চোখ-বাঁধা ভবের খেলায় ঘোরাঘুরি সারা হ'ল। ফুটপাথে ছড়ানো বইয়ের ছাই উড়িয়ে অমূল্যরতন খুঁজতে খুঁজতে আর্ট ক্রিটিক হঠাৎ একসময়ে সামনের দিকে তাকালেন। আদ্দি আর ক্যালিকোর ছিটের পাশেই অনেকগুলো ক্যালেণ্ডার। পার্কের রেলিংয়ে ঝুলছে। একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। নামহীন শিল্পী, ছবির নাম 'কুরুক্ষেত্রের পরে।' খোঁজ, খোঁজ, কে এঁকেছে। যে কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার, তাদের কাছ থেকে অনেক কষ্টে শিল্পীর নাম ধাম উদ্ধার করা গেল। পরের মাসে বিখ্যাত কোনো মাসিকে প্রভাকরের আঁকা খান দুই ছবি আর ছোট একটা প্রবন্ধ বেরুলো। শিল্পরসিক লিখলেন, 'বিষয়বস্তু পুরাণের, কিন্তু শিল্পীর চোখের আলো পুরানো নয়। আর পৃথিবীর স্মরণীয় সব শিল্পসৃষ্টির অভিনবত্ব তো শুধু এই আলো ফেলারই কারিকুরি ঃ নইলে রামায়ণ-মহাভারতের পর কেউ কি ছুঁতো রঘুবংশ-শকুন্তলা? কিম্বা একালের মেঘনাদ বধ? বিদায় অভিশাপ?'

প্রভাকর দেবের সঙ্গে আমার এই সময়েই পরিচয়। আমার প্রথম

কবিতার বই বেরুবে। কাকে দিয়ে প্রচ্ছদপট আঁকাই। কোন বন্ধু প্রভাকর দেবের নাম করলেন। বললেন, সবে নাম করেছে, এখনো পায়া ভারি হয়নি, ওকে দিয়ে সস্তায় কাজ সারতে পারবে।' কথাটা মন্দ লাগল না। প্রভাকর দেবের ঠিকানা যোগাড় করে সেদিনই সন্ধ্যাবেলা তার বাসায় যাওয়া গেল।

আজকে যাঁরা প্রভাকর দেবের সাইপ্রেসরো'র নয়নাভিরাম 'কটেজ' দেখছেন তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না আহিরিটোলার সেই স্যাঁত-সেঁতে একতলা বাড়ির রূপ: বাড়িটা শুধুই যদি একতলা হ'ত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু চার পাশে দোতলা-তিনতলার চক্রান্তে পড়ে মাঝখানের এই রুদ্ধশ্বাস বাড়িটাতে না আছে বাতাস, না আলো। জীর্ণবাসের মতো চূণের আস্তর অনেকদিনই খসেছে। কিন্তু নতুন জোটেনি। বাইরের দেয়ালের লজ্জা নিবারণ করছে ঘুঁটে, কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখলুম, নোনাধরা ইটের খাঁজে খাঁজে ছারপোকার নিঃশব্দ পরিখা।

একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে প্রভাকর আমাদের বসালেন। ঘরের কোণে একটা তক্তপোষ, তক্তপোষের নিচে তোরং বুঝি ওটা; মেজেয় শততালি একটা শতরঞ্চি। শতরঞ্চি নাম সার্থক, এত রঙ পড়েছে যে আসল রঙ কী ছিল বোঝবার উপায় নেই।

প্রভাকর বললেন, 'এই আমার স্টুডিও।'

এই স্টুডিও? সরঞ্জাম কই ছবি আঁকার?

প্রভাকর জানালেন, সরঞ্জাম লাগে না। লাগে না? না। তক্তপোষে ঠেসান দিয়ে পট রাখি, ওই আমার ইজেল। কিন্তু আলো? আলো লাগে না। আলোর সাত রঙ তো আমার বাক্সে।

সবচেয়ে বিস্মিত হ'লাম প্রভাকর যখন বললেন, প্রচ্ছদপট আঁকার জন্যে তিনি কিছু নেবেন না। কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদপট, তার আবার টাকা। বই তো আর বিকোবে না, বন্ধুদের বিলোবেন। না হয় ওই সঙ্গে আমার ছবিও বিলিয়ে গেল।

উঠি উঠি করছিলুম, বুঝতে পেরে প্রভাকর বললেন, 'বাঃ রে চা খেয়ে যান।'

আতিথ্যের অপমান করা হবে এবং কথাটা রুচি এবং ভদ্রতা-বিরোধীও বটে, তবুও এ-কথা না লিখে পারছি না যে, সেই চা মুখে তুলতে পারিনি। কলাইচটা স্টীলের পেয়ালা, জলটা গরম বটে, কিন্তু দুধ-চিনি মাত্রই নেই। চায়ের পাতাও সম্ভবত, এবং সহজবোধ্য কারণে, শস্তা, কেমন একটা পচাতুলসী গন্ধ। পেয়ালাটা তবু ঠোঁটের কাছে তুলছিলাম আর মাঝে মাঝে নামিয়ে রাখছিলাম, অন্ধকারে প্রভাকর বুঝতে পারেননি,—আর অপলক চোখে দেখছিলাম যিনি চা নিয়ে এলেন, তাঁকে।

নিবেদিতা দেবীকেও সেই প্রথম দেখলুম। দেখার মত কিছু নয়, পরনে লালপেড়ে একখানা মিলের শাড়ি ছিল, কৃশ দু'খানা হাতে সঙ্গীহীন নোয়া দু'গাছি নিঃশব্দ। তখনো কাঁচের চুড়ির এমন চলন হয়নি। চা দিয়ে দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। কপাল অবধি ঘোমটাটানা। সে-মুখ সুন্দর না কুৎসিত অন্ধকারে বোঝবার উপায় ছিল না। এমন কি বয়সটাও আন্দাজ করতে পারিনি। ভাঙা ভাঙা চোয়ালের ওপরে শ্রান্ত দু'টি চোখ; সে চোখের বয়স, কে জানে, ষোল, না, ছাব্বিশ না ছত্রিশ।

এর পরে নিবেদিতা দেবীকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন নিবেদিতার বয়স কমছে। এক একটি জন্মদিন হ'ত নিবেদিতার, মনে হ'ত একটি বছর বয়স কমল। শীর্ণ কপোল দুটি ভরল প্রথম, তারপর তাতে অল্প অল্প রঙের ছোপও লাগল, স্তিমিত চোখ দুটির তারা সরসীর মতো টলটল করে উঠল। এ নিবেদিতা প্রায়ান্ধকার ঘরে অচেনা অতিথিকে চিনিহীন চা দেবার কুণ্ঠায় দরজার কোণে দাঁড়িয়ে থাকতেন না, হাজার অতিথির ভিড়েও নিজেকে না হারিয়ে দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে, অমায়িক হেসে গৃহস্বামিনীর কর্তব্য পালন করেছেন। কিন্তু সে-কথা পরে।

এর পর প্রভাকরের ছবির কিছু কিছু আদর হতে লাগল। প্রথম দু'চারখানা মাসিক সাময়িক পত্রাদিতে ছাপা হ'ত; তাতে নাম হ'ত, টাকা আসত না। কিন্তু ধীরে ধীরে ওঁর ছবি বিক্রীও হতে লাগল। যাঁরা ছবি কেনেন তাঁরা আর পাঁচজনের সঙ্গে প্রভাকরের ছবিও নিতে লাগলেন একখানা দু'খানা করে। উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে প্রভাকর অনন্য না হোক, অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।

অবশ্য আমার সঙ্গে প্রভাকরের সম্পর্ক বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রচ্ছদ-পট আনতে একদিন গেলাম, বই ছাপা হলে এক খণ্ড উপহার দিতে আরেক দিন। প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে প্রভাকর দেবের কাছে ভূমিকায় ঋণ স্বীকার করেছিলাম, পড়ে তিনি ছেলেমানুষের মতো খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমাকে আর বাড়িয়ে তুলছেন কেন; আমার তো জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেছে—'

অর্ধেকটাই? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি 'বয়স কত আপনার?'

'তা চল্লিশ হবে বৈকি। ভুলে যাবেন না, আমার জীবনের পোনেরো বছরই কেটেছে থিয়েটারের সীন এঁকে। আজ আপনারা আসছেন, এ আমার বড় সুখের। কিন্তু এ-বয়সে প্রতিষ্ঠা দিয়ে করব কী। আপনাদের অল্প বয়স, সমস্ত জীবনটাই সমুখে পড়ে আছে। আপনাদের সামান্য কাজ করে দিতে পেরেছি এতেই আমি কৃতার্থ।'

সেদিন প্রভাকর অনুমানও করতে পারেন নি দশ বছর পরে আমারই কৃতার্থ বোধ করার পালা আসবে। আমার কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা প্রভাকর দেবের, এতেই লোকের চোখে আমার মূল্য বেড়ে যাবে।

সেদিন সবিনয়ে বলেছিলাম, 'বইখানা পড়ে দেখবেন।'

'পড়ব বৈকি' প্রভাকর লজ্জিত হেসেছিলেন, 'তবে বুঝব কি না জানি না। বিশেষ অভ্যেস নেইতো। তবে ও বুঝবে ঠিক।' সহাস্যে দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন।—'ও গল্প-কবিতার বই পড়তে খুব ভালোবাসে।'

লজ্জায় অরুণ হয়ে নিবেদিতা দেবী মুখ ফিরিয়েছিলেন, মনে আছে।

সেদিন দিনের আলোতে দেখলাম বলেই ঠিক মনে হ'ল কি না জানি না, নিবেদিতা দেবীর শাড়িখানা আগের দিনের চেয়ে ঢের ফর্সা। হাতে দু'গাছি রুলিও দেখলাম। আগের দিন দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

পরের রবিবার জনকয়েক বন্ধু নিয়ে গেলাম। আজ বাড়ির চেহারা আলাদা। বাইরে তখনো জনকয়েক রাজমিস্ত্রী খাটছে, ভেতরের দেয়াল ঝকঝক করছে।

নিবেদিতা দেবী যুক্তকরে অভ্যর্থনা করলেন, 'আসুন।'

বললাম, 'চেনবার যো রাখেননি একেবারে।'

একটু যেন অপ্রতিভ হলেন নিবেদিতা দেবী, একটু চমকে উঠলেন। ক্ষীণ গলায় প্রতিবাদের সুরে বললেন,—'না, না, এ আর কি। আজ ধোবাবাড়ির ভাঁজ ভেঙে পরেছি, তাই।'

শুধু ধোবাবাড়ির ভাঁজ-ভাঙা কাপড়েই কি চেহারার এমন জৌলুষ বাড়ে। তা নয়। সিঁদুরের টিপটাও আজ বড়ো করে পরেছেন নিবেদিতা দেবী, পানখাওয়া ঠোঁটদুটিও টুকটুকে।

বললাম, 'আমি আপনার কথা বলিনি। বাসাটার কথাই বলছিলাম।'

নিবেদিতা দেবী আরেকবার অপ্রতিভ হলেন। তবু হেসে বললেন, 'তাই বলুন। হ্যাঁ, বাসাটার কলি ফেরাতে হ'ল। আগে দু'জনে চুপ চাপ ছিলাম, কেউ কোন খোঁজখবর রাখতো না। এখন আপনার পাঁচজন আসছেন—'

প্রভাকর নিজেই পরে ব্যাপারটাকে বিশদ করে বুঝিয়েছিলেন,—'দু'খানা ছবি খুব চড়া দামে বিকিয়ে গেল, বুঝলেন। জামঝুরি স্টেটের দেওয়ান নিজে এসেছিলেন, পছন্দ করে নিয়ে গেলেন। এই সুযোগে বাড়িটারও একটু সংস্কার করিয়ে নিচ্ছি।'

বন্ধুদের সবার সঙ্গে নিবেদিতা দেবী হেসে কথা বলেছিলেন, মনে আছে। খুব সপ্রতিভ, হাসিখুশি। বার কয়েক চা দিয়ে গেলেন। আগের বারের চায়ের সঙ্গে এবারকার চায়ের তারতম্যটা একা আমিই শুধু উপভোগ করলাম।

এর পরে আর কোন দিন এসে আমি প্রভাকর দেবকে একা পাইনি। শুরু হ'ল ভক্ত, গুণমুগ্ধের ভিড়। স্তুতির আরতি। যখনই গেছি কেউ না কেউ আছেনই। আর আছেন নিবেদিতা দেবী। অতিথির অক্লান্ত আপ্যায়নে, অকুণ্ঠ ধারায় চায়ের পরিবেশনে। লোকের ভিড় প্রভাকর বেশি সহ্য করতে পারতেন না, দু'চার মিনিট গেলেই অসহিষ্ণু, ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, একটা পার্টিশনের আড়ালে স্টুডিও বানিয়েছিলেন, তার আড়ালে পালাতে চাইতেন।

আর, সবাইকে সামলাতেন নিবেদিতা দেবী। সাধারণ একটি মেয়ে, এই সেদিনও এঁকে দারিদ্র্যের ভারে কুণ্ঠিত, জড়ো-সড়ো দেখেছি; অকস্মাৎ যেন সব সংকোচের ওড়না খসিয়ে সহজ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অবাক বৈকি। খুব বেশি লেখাপড়া শিখেছেন বলে মনে হয় না, অথচ অতিথিদের সঙ্গে কেমন সহজভাবে বিবিধ বিষয়ে আলাপ চালিয়ে যান, যে অতিথিদের মধ্যে আছেন দু'জন অধ্যাপক, অন্তত তিনজন আর্ট ক্রিটিক, ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে রিসার্চ করছে এমন জন চারেক ছাত্র, এ ছাড়া কোথাও পাত্তা-না-পাওয়া আমাদের মতো আধডজন কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পলেখক তো আছেই।

প্রভাকরের একটা শখ ছিল, মাঝে মাঝে আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। আমরা কুণ্ঠা প্রকাশ করলে বলেছেন, 'আপনারা আমাকে ভালবাসেন, দয়া করে আসছেন এতেই আমি ধন্য। কিন্তু শুধু আর্টে কি পেট ভরে। আর সে-কথাটা আমার মতো মর্মে মর্মে ক'জন জানে, বলুন। তাই মাঝে মাঝে স্থূল আহার্যেরও আয়োজন করি।'

প্রভাকর ইতিমধ্যে দোতলায় একখানা ঘর তুলে নিয়েছিলেন। সেই ঘরে সারি সারি আসন পড়ত। নিজেরাই কলা-পাতা ধুয়ে নিয়ে বসে গেছি; নেবু কেটে নেবারও অপেক্ষা রাখিনি। কখনো কখনো হাতে হাতে ঠেকাঠেকিতে মাটির গ্লাস গড়িয়ে সারা ঘরে গঙ্গাযমুনা বয়ে গেছে, ভ্রূক্ষেপ করিনি।

আমাদের পরিবেশন করতেন নিবেদিতা দেবী। একা হাতে, সব।

শক্ত করে কোমরে আঁচল জড়ানো, কপাল ঘিরে টায়রার মতো ঘামের ফোঁটার মালা; কিন্তু ঠোঁটের হাসিটি অম্লান। কখনো কখনো পেরে উঠতেন না, ডাল আনতে আনতে ভাজা ফুরিয়ে যেতো, ভাজা আনতে আনতে ভাত। তাতে আরো ছুটোছুটি করতে হয়েছে, কপালের ঘাম গড়িয়ে দু' ফোঁটা চিবুকে, এক ফোঁটা নাকের ডগায়, কর্ণমূল থেকে কয়েক ফোঁটা গ্রীবায় নেমেছে, কিন্তু হার মানেন নি। সবার সঙ্গে হেসেছেন, কোমরে আরো শক্ত করে আঁচল বেঁধেছেন।

সে-বছর শীতকালে আমরা প্রভাকরের ছবির প্রদর্শনী খুললাম। সেই প্রথমবার। কাগজে কাগজে সচিত্র সমালোচনা ছাপা হ'ল। অনেকের প্রভাকর সেই প্রথম সকলের হলেন। ঘর ভাড়া এবং আরো সব খরচা বাদ দিয়েই সেবারে কয়েক হাজার টাকা লাভ হ'ল।

রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের আড্ডা বসত। সেই আহিরিটোলার বাসার দোতলার ঘরে। প্রভাকর রোজ একজিবিশনে যেতেন না, আমাদের কাছ থেকে খবর শুনতেন। কত লোক হয়েছিল, কোন্ কোন্ ছবি বিক্রী হ'ল খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। আর শিশুর মতো হেসে উঠতেন: বলেন কী। আজ দু'শো লোক হয়েছিল? প্রিন্সিপাল সর্বানন্দবাবু নিজে ছাত্রদের নিয়ে এসেছিলেন? বলেন কী।

কাগজে প্রদর্শনীর রিভিয়ু দেখে হেসে কুটি-কুটি হতেন। 'এরা কী লিখেছে দেখুন: 'প্রভাকর দেবের ছবি দেখলে বোঝা যায়, ভারতীয় শিল্প উজ্জীবনের ঠিকানা অজন্তা-গুহার পলাতক পথে নয়; কিউবীয় জ্যামিতির ক্লান্তিকর জটিলতায় নয়; পৃথু জীবনের পৃথুতর রূপায়ণে নয়, সপ্তডিপর মনীষীর অরুচি বদলের চাট্‌নি নয়, এমন কি লোকায়ত পটশিল্পের পালিশ করা পরিবেশনেও—কী খটমটে বাঙলা লিখেছে দেখুন।'

হাসতে হাসতেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতেন প্রভাকর। কতকটা আপন মনে ধীরে ধীরে বলতেন, 'এরা ভালোবাসে, তাই লেখে। কিন্তু আমি তো জানি, আমি এখনো ভাষাই খুঁজে পাইনি। দেয়ালে

যেখানে এখনো অন্ধের মতো মাথা ঠুকছি, আলোর রেখা এখনো চোখে পড়ল না।'

আমরা জানতাম এ শুধু বিনয়ের ঘোমটা পরানো দম্ভ নয়, প্রভাকর আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন তিনি সার্থকতার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেননি। তাঁর মতো আর কে অসহিষ্ণুর মতো সারা জীবন পদ্ধতির পর পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করেছে? আর কে চির অতৃপ্তিতে নতুন নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধান করে ফিরেছে?

ঐ আহিরিটোলার বাড়িতেই প্রভাকর বরাবর ছিলেন; শুধু জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়েছিলেন সাইপ্রেস রো'য়ে নিজের তৈরী বাড়িতে।

বাড়িখানি নিবেদিতা দেবী নিজের পছন্দ মত তৈরী করিয়েছিলেন, হট্টগোল থেকে অনেক দূরে; ঝাউয়ের ছায়ায় ঝিমানো পথের শেষে নিভৃত শিল্পকুঞ্জ।

গৃহপ্রবেশের দিন ঘটা করে চায়ের পার্টি দিলেন সবাইকে। প্রশস্ত লন, সারি সারি টেবিল, জোড়া জোড়া চেয়ার। দীর্ঘ ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় ঘাসের ওপর ডোরা কাটা। উর্দি পরা ভৃত্যেরা নিপুণ হাতে পরিবেশন করছে সব। নিবেদিতা দেবী উল আর কাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদ্বির করছেন, কোথাও কোন ত্রুটি না ঘটে। শাদা ক্রেপ পরা মহীয়সী মূর্তি, আধখানা কপালে ঘোমটা, বাকি আধখানায় বিকেলের মরে আসা আলোর আভা।

এতলোককে নিজের হাতে পরিবেশন করা সম্ভব নয়, জানি, তবু আহিরিটোলার বাসার কর্মচঞ্চল দুটি হাত আর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরা শ্রান্ত মুখ মনে পড়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম নিবেদিতা দেবী আমার প্লেটে আরো দু'টো পেসট্রি দেবার জন্তে বয়কে নির্দেশ দিচ্ছেন।

সবাই চলে যাবার পর আমরা কয়েকজন আরও কিছুক্ষণ থেকে গিয়েছিলাম। নিবেদিতা বললেন, 'আপনাদের শিল্পীকে এতদিনে তাঁর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিতে পেরেছি এই সান্ত্বনাটুকুই আমার

পাওনা। সত্যি কী বিশ্রী যে ছিল ওই আহিরিটোলায় বাসাটা, ঘিঞ্জি, গরম আর নোংরা। ওখানে উনি কী করে যে এতদিন শিল্পীমন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, ভাবতেই অবাক লাগে।'

প্রভাকর হাসলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি তো ছিলে।'

ওই একটি মাত্র কথা। কিন্তু প্রভাকর সম্পর্কে ওই একটি কথাই সব কথা। নিবেদিতা তো ছিলেন। প্রভাকরের যে মূর্তি জনসাধারণের সম্মুখে গড়ে উঠেছে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে আর ভালবাসার অঞ্জলিতে, তার কতখানি নিবেদিতা দেবীর তৈরী সেতো আমরা জানি। প্রতিমাকে যে সুন্দর দেখায়, তার কৃতিত্ব কি শুধু মৃৎশিল্পীর, না যে আরতি করে, পঞ্চপ্রদীপ সাজায়, তারো। এই শেষের কাজটা করেছিলেন নিবেদিতা দেবী।

মাথা নিচু করেছিলেন নিবেদিতা দেবী। কী-যে বলো। আমি আর কী করেছি।'

'কী করোনি। শুধু আমার রঙের বাক্স—তুলি আর পট গুছিয়ে দাও নি, আমমর জীবনটাকেও গুছিয়ে তুলেছ। তুমি না থাকলে—প্রভাকর ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি কবে হাউইয়ের মতো উড়ে-পুড়ে-ফুরিয়ে যেতাম।

নিবেদিতা দেবী মাথা নীচু করেই রইলেন, কিন্তু আর প্রতিবাদ করলেন না। মনে হ'ল এ প্রশস্তিটুকু তিনি মাথা পেতেই নিলেন। বিনয়ের বাড়াবাড়ি যে করলেন না, এটুকুও ভালই লাগলো। আর নিবেদিতা দেবী কী আর নিজের মূল্য জানেন না। তিনি কি আর বোঝেন না এই যে আজ যারা প্রভাকরকে ঘিরে ভীড় করেছে তারা সবাই প্রভাকরের গুণমুগ্ধ নয়, সবাই কিছু প্রভাকরের টানে এখানে ছুটে আসে না, নিবেদিতা দেবীর হাতে এক পেয়ালা চা খাবার লোভেও আসে। নিবেদিতা দেবী শুধু প্রভাকর দেবের স্ত্রীই নন, স্বনামধন্যাও। আর্ট-ক্রিটিক আর্ট-রসিক আর ছাত্রদের কাছে তাঁর আকর্ষণও কম নয়। নিবেদিতা দেবীর নিজের বয়স যদি চল্লিশের ওপর না হ'ত, তবে এ

কথাটার একটা কদর্থ হতে পারতো। কিন্তু দু' একটা চুলে তাঁর রূপালি পাক ধরেছে, এখন নিবেদিতা দেবীর নামোচ্চারণে যে ছবি চোখের সমুখে ভাসে, সেটা প্রসন্ন-সুন্দর-উদার আতিথ্যের।

তার পরের বছরই বুঝি প্রভাকরের পঞ্চাশোত্তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ঘটা করে জয়ন্তী করলাম। অনেক ঘটা, অনেক বাণী, ধূপ, মালা চন্দনের সমারোহ। আতিশয্যে মাঝে মাঝে প্রভাকর ক্লান্তি বোধ করেছেন, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। অনেক লোকের অবিরাম আনাগোনার মধ্যে যে প্রীতির স্নিগ্ধ প্রবাহ, তিনি সেটা অনুভব করেছিলেন, অভিভূত হয়েছিলেন।

সব হাঙ্গামা যখন চুকল, তখন আস্তে আস্তে আমাকে বললেন, 'কী, শখ মিটলো তো।'

বললাম, 'শখ কী বলছেন, এ-তো কর্তব্য। দেশ আপনার কাছে এত পেয়েছে, বিনিময়ে সামান্য একটু শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছে, এ আর এমন কী আর।'

না, না, না,। আপন মনেই প্রভাকর অস্ফুট উক্তি করলেন, এ ক'দিন আমার কী মনে হয়েছে জানেন? মনে হয়েছে এই জয়ধ্বনি আর হরি-ধ্বনির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যাক আমার অদৃষ্ট ভালো, নিজের 'বল হরি, হরি বোল' নিজেই শুনে গেলাম। স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। পরে আহত গলায় বললাম, 'এ কথা বলছেন কেন। আপনার কী আর এমন বয়স। এখনও অনেক কিছু সৃষ্টি করবেন আপনি।'

প্রভাকর ম্লান হাসলেন। চোখ দুটিতে একবার শুধু বিদ্যুৎ খেলে গেল।—'মিছিমিছি আমাকে আর সান্ত্বনা দেবেন না। আমার আর কিছু দেবার নেই! সব ফুরিয়ে গেচে। স-ব-ফু-রি-য়ে গে-ছে।' ধীর কণ্ঠে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন,—অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'নইলে এ-বাসায় এসেছি আজ এক বছরের ওপর,—এখানে এসে একটা ছবিও কেন সারা করতে পারলুম না? চেষ্টা করিনি তা তো নয়।

অনেকবার করেছি। এঁকেছিও ঢের। কিন্তু একটা ছবিও প্রাণ পায় নি।' ভগ্ন গলায় প্রভাকর বললেন,' 'আমার রঙ আর তুলি সেই আহিরিটোলার বাসাতেই রয়ে গেছে।'

ঠিক সেই বছরই শীতকালে প্রভাকর মারা গেলেন। আমরা তখন ওঁর ছবির প্রদর্শনী খোলার উদ্যোগ করছিলাম।

আজ এতদিন পরে মাঝে মাঝে পেছনে তাকিয়ে ভাবি প্রভাকরের প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তিটা কোথায়। তাঁকে নিয়ে সাধারণের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস, তার তুলনা তো খুঁজে পাইনে। স্তব-স্তুতি-স্তনিত রাজপথ দিয়ে প্রভাকর উদ্ধত শিরে হেঁটে গেছেন, বিজয়ীর মতো দৃপ্ত, কিন্তু নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার। শক্তি তাঁর ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু শক্তি তো আরও অনেকেরই থাকে; তাদের ক'জন পায় সর্বজনের এমন অকুণ্ঠ অভ্যর্থনা, প্রাণের উত্তাপ? সত্যিই কি জাতীয় শিল্পের মর্মবাণীটি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন, রঙে-রেখায় তাকে দিতে পেরেছিলেন রূপ?

অনেক সময়ে ভাবি, হয়ত পেরেছিলেন। কখনও সংশয় হয়। সাধারণ তাঁকে যে নিয়েছিল তার কারণ হয়ত এই আর সবাই যখন দুর্বোধ্য আপন আপন পদ্ধতির দুর্গে বন্দী, প্রভাকর তখন সকলের হয়ে সহজ করে এঁকেছেন: বলিষ্ঠ, স্থূল রেখায়,—প্রতীক ব্যবহারের পলায়ন-বিলাসে নয়। প্রভাকরের শিল্প সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় যে, তা অতিমাত্রায় বাস্তব, অতিবাস্তববাদের রুগ্নতা নয়। আর প্রভাকর রঙের অকৃপণ ব্যবহার জানতেন। পাংশু, অস্পষ্ট পটভূমিতে আঁকা ছবি তাঁর পছন্দ ছিলনা; তাঁর ছবি জলন্ত, চোখে বিঁধত, তবু সে-চোখ ফেরানো যেতো না।

'বহুকাল শিল্পীরা রঙে, তুলিতে আকাশের নীল ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন' প্রভাকর প্রায়ই বলতেন, 'আমি চাই কঠিন, পাথুরে মাটিতে

থাকতে। সবাই প্রদোষের স্বপ্ন আর গোধূলির স্বর্ণ আঁকার জন্তে পাগল,—আমার ছবি দগ্ধ মধ্যাহ্নের।'

জনতার কণ্ঠের প্রশস্তি জয়োল্লাসে পরিণত হ'ল, প্রভাকর যখন তাঁর বিষয়বস্তুও বদলালেন। পুরাণ নয়, নিসর্গ নয়, ইতিহাস নয়, শেষ জীবনে প্রভাকরের ছবিতে সম-সময়ের যে প্রাধান্ত দেখেছি, তাঁর জন-প্রিয়তার আসল কারণও বুঝি সেইটেই। খবরের কাগজের রিপোর্টের দৈনন্দিনতার মধ্যে প্রভাকর তাঁর শিল্পের উপাদান খুঁজতেন। হাট, জনসভা, বন্দর, ধর্মতলায় গুলী চালানো, ফুটপাতের ফিরিওলা, অক্‌সন মার্ট, এমন কি, রেসকোর্সের ভীড়। কোন কিছুই বাদ দেন নি, অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন নি। সে চোখ আবার কার্টুন আঁকিয়ের নয়, ফোটোগ্রাফারেরও নয়,—চিত্র শিল্পীর। আমরা মাঝে মাঝে বলেছি, 'এ কী করছেন। এ যে নেহাৎই একালের।'

গভীর প্রত্যয়ে প্রভাকরের কপাল প্রশস্ততর হয়েছে,—আমার কালকেই যদি আমি নিষ্ঠার সঙ্গে ফোটাতে পারি, তবেই কি আমার ছবি সবকালের হবে না! যা আজকের, তাই তো রোজকার।' একটু হেসে ফের বলেছেন, 'লাখ-লাখ-যুগ মোনালিসা-হাসি দেখেই বললেন, নয়ন-না-তিরপিত-ভেল। কিন্তু একটাকার ইলিশ চার টাকায় বেচতে পেরে মেছুনীর মুখে যে সংজ্ঞাহীন হাসি ফুটে ওঠে, তা কি কখনও দেখেন নি।'

সেই হাসিটুকুই প্রভাকর তাঁর ছবিতে ফোটাতে চেয়েছিলেন।

কিছুটা কৃতকার্য হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। কেননা, অন্তান্ত খ্যাত-নামা শিল্পীর ছবি যখন কেবল ড্রইং রুমের শোভা বাড়িয়েছে, প্রভাকরের ছবির সস্তা রিপ্রোডাক্‌সন দেখা গেছে খোলার ঘরে, ন' সিকে সিট রেন্ট মেসের দেওয়ালে।

একদা ক্যালেণ্ডারের শিল্পী আবার ঘরে ঘরে ফিরে গেছেন।

প্রভাকরের মৃত্যুর পর দলে দলে লোক যে সাইপ্রেস রো'য়ের কুটিরে গেছে, নিবেদিতা দেবী যে হাজার হাজার চিঠি পেয়েছেন,—যার সব

তিনি পড়েও উঠতে পারেন নি, আলাদা আলাদা জবাব দেওয়া দূরে থাক,—তাতেই শেষবারের মতো নিঃসংশয়ে স্থির হয়ে গেছে লোকচিত্তে প্রভাকরের আসন কোথায়।

প্রভাকরের মৃত্যুর পরদিন নিবেদিতা দেবীর যে রূপ দেখেছিলাম; তা ভুলব না। ক্ষান্তবর্ষণ আকাশ, যুদ্ধ বিরতির পর রণক্ষেত্র—এই জাতীয় কয়েকটা তুলনা মনে এসেছিল, কিন্তু এর একটাতেও কি সেই ছবির ব্যঞ্জনা আসে। ক্রেপ নয়, সিল্ক নয়, আগাগোড়া শাদা খদ্দরের শাড়ি, শাদা ব্লাউজ। মাথা নীচু করে বসেছিলেন, ঈষৎ রক্তিম চোখ দুটি তুলে তাকালেন। নিবেদিতা দেবী একটু হেসেও ছিলেন হয়ত, কিন্তু সে হাসি কান্নার চেয়ে মর্মান্তিক। সারা রাত শিশিরে ভেজা পদ্মের সঙ্গে একটা ক্ল্যাসিক্যাল সাদৃশ্য সে-মুখের আসে; উপমায় আসলের ফোটে কতখানি।

আরও অনেককে দেখলাম। আর্ট ক্রিটিক, আর সম্পাদক; কবি যশঃপ্রার্থী আর রিসার্চ-স্কলার। সৌরমণ্ডলীর সেই পুরণো গ্রহ-উপগ্রহ। সেদিন চা খাওয়ার কথা উঠে না, তবু নিবেদিতা দেবী সবাইকে আপ্যায়িত করলেন। অতিথিবাৎসল্য, আঁতুরের মতোই, নিয়ম মানে না।

সকলের মাঝখানে সর্বশুক্লা নিবেদিতা দেবী। তেমনি মহীয়সী। আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললাম, 'মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না। খ্যাতির পূর্ণ জয়ে তিনি মারা গেছেন। কিন্তু কীর্তি আছে। ওঁর আঁকা ছবির রঙ হয়ত কোন দিন মিলিয়ে যাবে, কিন্তু মানুষের মনের প্রীতির রঙ মেলাবে না।'

নিবেদিতা দেবী চেয়ে চেয়ে শুনলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'সেই সান্ত্বনা। এ শোক আমার একার নয়। আর শোকই বা কেন।'

প্রভাকরের মৃত্যুর পর ছ'মাস ধরে এমন পত্রিকা ছিল না যাতে প্রভাকরের অপ্রকাশিত কিছু-না-কিছু ছবি বেরোয়নি। পাণ্ডিত্যপূর্ণ

প্রবন্ধে আর শোকাকুলের উচ্ছ্বাসে প্রভাকরের শিল্পসৃষ্টির মূল্য আরেক-বার নিরূপিত হ'ল।

অবশ্য নিবেদিতা দেবী ছিলেন বলেই সব সম্ভব হয়েছে। প্রভাকরের জীবনের খুঁটিনাটি যে যখন যা জানতে চেয়েছে, নিবেদিতা দেবী সানন্দে জানিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য শোকসভায় তিনি নিজে উপস্থিত থেকেছেন, প্রভাকরের আবক্ষ প্রতিকৃতির পাশে শুভ্রবস্ত্র-মণ্ডিত গম্ভীর-করুণ মূর্তি।

জয়ন্তীর পরের বছরের জন্মদিন যথোচিতভাবে উদ্‌যাপিত হ'ল। সভাশেষে নিবেদিতা দরজা অবধি এসে আমাদের বললেন, 'আসবেন মাঝে মাঝে। একা পড়ে থাকি। একেবারে ভুলবেন না।'

সকলে সমস্বরে বললাম, 'ভুলব কী। এ-যে আমাদের তীর্থ!'

পথে কে-একজন বললেন, 'ভদ্রমহিলার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়। নিজে আর্টিস্ট নন কিন্তু আর্টিস্ট স্বামীর মধ্য দিয়ে আর্টকেও ভালোবেসেছিলেন।'

আর ভুলব কী। নিবেদিতা দেবী ভুলতে দিলেন কই। সাইপ্রেস-রো'র মধুচক্রটি ভাঙতে দিলেন না। সেখানে প্রায়ই চায়ের আসর। কোনদিন সকালে ফোন করে তলব করেছেন; হাজির হয়ে দেখেছি সেখানে আরো অনেকে উপস্থিত।

নিবেদিতা দেবী বলেছেন, 'ওঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে কী করা যায় বলুন তো।'

তৈরি হ'ল কমিটি। চাঁদা উঠল মন্দ না। সরকারও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু প্রভাকরের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হয় কিসে। মর্মর মূর্তি? রাস্তার নামকরণ? না।

তবে কি আর্ট স্কুল? বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষাদানের জন্যে একটা চেয়ার? প্রভাকরের নামে একটা জাতীয় চিত্রশালা খুললে কেমন হয়?

শেষের প্রস্তাবটাই মনঃপূত হ'ল। প্রভাকরের প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকীতেই চিত্রশালার ভিৎপ্রস্তর স্থাপিত হ'ল। হাসিতে ভরে

গেল নিবেদিতা দেবীর মুখ। ভারতবর্ষ তবে শিল্পীর সম্মান দিতে জানে।

জিজ্ঞাসা করলাম; 'আপনি কি এবারে কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসবেন? ঘুরে আসবেন, আসুন না। এতে শরীর-মন দুই-ই ভালো হবে, দেখবেন।'

ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকালেন নিবেদিতা। 'চলে যাবো? চলে যেতে বলছেন? পালিয়ে গিয়ে ভুলে থাকবো সে-ও কি হয়। তার চেয়ে এ ঢের ভালো আছি। ওঁর স্মৃতি, ওঁর অসমাপ্ত কাজ নিয়ে। আপনারা পাঁচজন আসেন—'

বললাম, 'তবু চিত্তশান্তির জন্যে মানুষ মাঝে মাঝে নির্জনতা খোঁজে।'

নিবেদিতা বললেন, 'খুঁজুক। সে মুক্তি আমার নয়। এখনো কতো কাজ বাকি। ভালো কথা, প্যারিস থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। ওখানে ওঁর ছবির একটা একজিবিশন খুলতে চান। পরামর্শ দিন তো, কী ভাবে কী করা যায়। অতোদূর পাঠালে ছবিগুলো নষ্ট হবে না তো।'

আলাপে-পরামর্শে সেদিন কাটলো। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হ'ল না।

নিবেদিতা দেবী ফের পরের দিন যেতে সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন, —'কালকে ফের আলোচনা করা যাবে। সকলেই আসুন না আরেকবার। এখানেই চা খাবেন।'

প্রদর্শনী সম্পর্কিত পরামর্শ চলল আরো তিনটে বৈঠকে। পেয়ালায় চা ফুরোয়, আবার চা আসে। নিবেদিতা হাসেন। আরেকটু চিনি? কেক একটা?

বোঝা যায়, চা-টাই লক্ষ্য, আলোচনাটা উপলক্ষ্য।

প্রদর্শনীর একটা মীমাংসা হ'ল তো নিবেদিতা দেবীর আরেক খেয়াল হ'ল। শিল্পী আর শিল্পরসিকদের নিয়ে একটা সংঘ গড়বার কথা তাঁর মনে এসেছে। কেমন হয়? ধরুন, 'প্রভাকর আর্ট সোসাইটি'?

সকলে সমস্বরে সায় দিলেন।

নিবেদিতা দেবীর চোখ দু'টি ছল ছল হ'ল। 'শিল্পীদের সঙ্গে সাধারণের ওইখানেই তো তফাৎ। তাঁরা বেঁচে থাকেন সকলের স্মৃতিতে, বন্ধুজনের প্রীতিতে। গান ফুরোলেও তার রেশ থাকে; শিল্পীদের জীবন ফুরোয়, কিন্তু থাকে 'জীবনবাণী'।

কিন্তু নিবেদিতার হিসাবে ভুল হয়েছিল। জীবন নশ্বর, এটা তিনি অবশ্যই জানতেন, জানতেন না কীর্তিও শাশ্বত নয়। অন্তত সব কীর্তি নয়।

কালের ধুলোর আস্তর পড়েছে প্রভাকরের নামের ওপরেও। কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, প্রভাকরের নামের সেই যাদু আর নেই। তাঁর উল্লেখমাত্রে গুণীজনেরা গদ্‌গদ হয়ে পড়ছেন না। যে বিষয়বস্তু নিয়ে প্রভাকর শেষের দিকের ছবি এঁকেছিলেন, তাতে একসময় সাড়া পড়েছিল বটে, কিন্তু সমসময়ের মুখচেয়ে আঁকা সেই ছবিগুলোর এখন আর অতিরিক্ত কোন আবেদন নেই। তাদের মধ্যে শিল্প সমালোচকেরা গভীর কোন ব্যঞ্জনা খুঁজে পান না। অঙ্কনপদ্ধতি নিয়েও নতুনতর পরীক্ষা চলেছে। শিল্পজগতে আরেক যুগের পদধ্বনি অস্পষ্ট শোনা যায়, সে যুগ প্রভাকরোত্তর।

কে জানে নিবেদিতা এটা লক্ষ্য করেছিলেন কিনা। কিন্তু সাইপ্রেস রো'-এর বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা যে কমে এসেছে এ-তো ক্ষীণদৃষ্টিরও চোখে পড়বে। ডাকেও আর তেমন গাদা গাদা চিঠি আসে না। রিসার্চের স্কলাররা এখনো আসেন বটে, আর্ট ক্রিটিকেরা কদাচিৎ। আর অধ্যাপকেরা কালে-ভদ্রে, অর্থাৎ জন্মদিনে আর মৃত্যুদিনে।

এ দুটি দিন নিবেদিতা দেবী এখনো ঘটা ক'রে উদ্‌যাপন করেন। সভা হয়, গুণী ব্যক্তিরা আগের মত বক্তৃতা দেন, কিন্তু করতালিতে তেমন সুর বাজে না।

সবচেয়ে শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল সম্প্রতি। বিদেশ থেকে প্রভাকরের দু'জন অনুরাগী এসেছিলেন। তাঁদের সম্মানে নিবেদিতা একটা চায়ের পার্টি দিলেন। প্রায় দু'শো লোককে বেছে বেছে নিমন্ত্রণ চিঠি দেওয়া হ'ল। নতুন ক'রে সাজানো হ'ল লন।

সময় ছিল চারটে। কেউ এলো না। অসহিষ্ণু নিবেদিতা দেবী একবার ঘড়ি একবার পথের দিকে তাকাচ্ছেন। বিরক্ত অধরে দাঁত বসে যাচ্ছে। সাড়ে চারটে থেকে দু'চারজন করে আসতে লাগলেন, কিন্তু সব শুদ্ধ দশ বারোজনের বেশি হ'ল না।

আসর জমল না। শেষ পর্যন্ত আমাদেরই মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বিদেশী দুজনকে স্বাগত জানালেন। বিদেশী দু'জনও মিন মিন করে সৌজন্যসম্মত একটা প্রত্যুত্তর দিলেন। সভা ভঙ্গ হ'ল। আমরা যে ক'জন গিয়েছিলাম, একে একে চলে এলাম। নিবেদিতা দেবী হাত তুলে নমস্কার করলেন মাত্র। কোন কথা বললেন না, গেট পর্যন্তও এলেন না।

ফেরবার পথে পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে বললাম, 'নিবেদিতা দেবী আজ একেবারে ভেঙে পড়েছেন।'

বন্ধু বললেন, 'ভাঙবারই কথা। কিন্তু নিবেদিতা দেবী কী করে জানবেন বলো যে আজ জগদীশ পালের বাগান-বাড়িতে সব আর্টিস্ট আর আর্ট ক্রিটিকেরা ভীড় জমিয়েছে।'

'জগদীশ পালের ওখানে?'

বন্ধু বললেন, 'ভাস্কর জগদীশ পালের নাম জানো না? আজকাল তো ওরই নামডাক শোনা যাচ্ছে। নতুন ধরণের কী একটা ক্লে দিয়ে একটা মূর্তি তৈরি করেছে, আজ তার অবগুণ্ঠন উন্মোচনের দিন। টাকা আছে বিস্তর, কিছু কিছু প্রতিভাও আছে। জগদীশ পাল নাম করবে হে।'

আর কিছু বললাম না।

এর পরেও নিবেদিতা দেবী কী একটা উপলক্ষে একটা টী-পার্টি

দিয়েছিলেন। সেটাতে আমি যাইনি। তারপর আজ আবার কার্ড পেলাম। লাঞ্চের নিমন্ত্রণ।

আয়োজনের ত্রুটি নেই। টেবিলের ওপর ধবধবে আচ্ছাদনী। গ্লাসের মধ্যে অর্ধমুদিত শ্বেতপদ্মের মতো তোয়ালে। কাঁটা, চামচ, প্লেট, ছুরি।

নিবেদিতা আজ গলায় একছড়া শাদা শঙ্খের মালা পরেছেন, শাদা পরিচ্ছদের সঙ্গে মিলিয়ে। মুখে সেই প্রসন্ন,পরিচ্ছন্ন হাসি।

আজ প্রায় পুরনো, পরিচিত সবাইকেই দেখলাম। সেই অধ্যাপক আর সমালোচক, ছাত্র আর কবি। খাবার পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যে যার পার্শ্ববর্তীর সঙ্গে মৃদুগুঞ্জনে আলাপ শুরু করলেন: অধ্যাপকেরা ক্লাশের গল্প, ছাত্রেরা ক্লাশ পালানোর। রিসার্চ স্কলারেরা আপন আপন থিসিস লেখার জন্যে সবিনয়ে মশলা চাইলেন; আর্ট ক্রিটিক মাথা নাড়লেন। না, নতুন কোন মালমশলা তাঁর কাছে নেই। বরং অমুকের খোঁজ করুন। অবশ্য দেবে, ভরসা নেই, লোকটা আবার কিছু হাত-ছাড়া করতে চায় না, যখের মতো আগলে রাখে। যাক, ভাবনা করবেন না, যত্ন করে লিখে যান, সিদ্ধি অবধারিত; মনে রাখবেন যত শক্ত করে লিখবেন, তত নাম হবে।

—'শিপ্রা দত্তর নাম শুনেছেন?'

আর্ট ক্রিটিক গদ্‌গদ হয়ে পড়লেন, 'আঃ, চমৎকার গায় মশাই।'

—'গায় না তো! আঁকে।'

—'আঁকে নাকি?' আর্ট ক্রিটিক অপ্রতিভ মুখে একটা ফ্রাই পুরে দিয়ে বললেন, 'কী জানি, দেখিনি। মেয়েটিকে কিছু ছবি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলবেন তো। প্রমিসিং হলে কালচারাল রিভিয়ুতে একটা write-up দিয়ে দেবো।'

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলুম, এঁরা কেউ প্রভাকর দেবের নামও করলেন না। নিবেদিতা দেবী নিজে দু'একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রভাকর দেবের

শিল্প প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, কিন্তু দু'এক কথার পরই মোড় ফিরে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবিষ্কার করলাম আমরা সবাই তরুণতম ভাস্কর জগদীশ পালের প্রতিভা নিয়েই আলোচনায় মত্ত। মনে হল, নিবেদিতা দেবী একবার করুণ চোখে আমার দিকে তাকালেন। পরমুহূর্তেই তাঁকে ঘাড় ফিরিয়ে তালিকার পরবর্তী ভোজ্য আনতে আদেশ দিতে শোনা গেল।

সেই মুহূর্তে কী জানি কেন, আহিরিটোলার বাসার কথা মনে এসে গেল। সেখানেও এমনি ভীড় হ'ত, অধ্যাপক, সমালোচক আর অনুরাগীর ভীড়। প্রভাকর সবাইকে ভালবাসতেন; প্রভাকরকে ঘিরে বসত সবাই।

আর নিবেদিতা দেবী ছিলেন। সেটা উপরি। তিনি খাবারের থালা নিয়ে ছুটোছুটি করতেন, তাঁর কপাল এমনিই ঘামে ধুয়ে যেতো। তফাতের মধ্যে এই, সেদিন এরা যেচে এসেছে, আর আজ এদের ডেকে আনতে পেরেই নিবেদিতা কৃতার্থ।

খাওয়া দাওয়ার পর পান ছিল, সিগারেট ছিল। ত্রুটি নেই। কেউই বেশিক্ষণ বসলেন না। কাজের অজুহাত দিয়ে সরে পড়তে লাগলেন।

বিদায় দিতে সদর রাস্তা অবধি এলেন নিবেদিতা দেবী। নমস্কার করলেন। ক্ষীণকণ্ঠে একবার শুধু বললেন,—'আসবেন মাঝে মাঝে। আসছে রবিবার আমাদের এই বাসায় গৃহপ্রবেশ বার্ষিকী। সেদিন যদি—'

শুনলুম ভাঙাভাঙা গলা। দেখলুম কপালে ফোঁটাফোঁটা ঘাম। এতদিনে বুঝি টের পেলেন শিল্পীর সঙ্গে এরা শিল্পীর স্ত্রীকেও সহমরণে পাঠিয়ে বসে আছে।

বসুধরৈ

নিজের বাড়ী হলেও বাইরে থেকে সুরপতি একবার কড়া নাড়লে। কেননা, সদর দরজার ঠিক পরেই কলতলা, এবং কলতলাটা বে-আব্রু। বাথরুম অবশ্য আছে, কিন্তু বাড়ীতে লোকও অনেক। বাথরুমের ভরসায় থাকলে সকলের গা ধুতে ধুতে রাত দশটা বাজবে। বাড়ীতে যখন বেটাছেলে কেউ থাকেনা, মেয়েরা সেই সময়ে, অর্থাৎ দুপুরে, একটু ঢিলেঢালা, অসতর্ক ভাবে থাকে, সুরপতি জানে। দু'একদিন সাড়া না দিয়ে ঢুকে পড়তে দু'একটি অপ্রস্তুত মেয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালিয়েছে, দেখে সুরপতি নিজেই অপ্রস্তুত হয়েছে। এরা সবাই অবশ্য অল্পবয়সী, প্রায় তার মেয়ের মতন; কিছু না কিছু সম্পর্কও আছে সবার সঙ্গেই। কারুর মামা, কারুর মেশো, কারুর কাকা, কারুর পিসে। তবু বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়েদের সান্নিধ্যে সুরপতি প্রথম যৌবন-কাল থেকেই কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এসেছে, আজও কাটাতে পারেনি।

কলতলা পেরিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ির শেষে দোতলায় করিডর, যার দু'ধারে ছোট বড় মিশিয়ে খান ছয়েক ঘর। সুরপতি সেখানেও দাঁড়ালো না। ছাতা এবং জুতো দিয়ে ঠুক ঠুক শব্দ করতে করতে চলে এলো তিনতলায়, যাকে ছাতও বলা যায়। তিনতলায় ঘর মোটে একখানি, সামনে খোলা একটু ছাত। সুরপতির এইটুকু মাত্র স্বার্থ-পরতার পরিচয় আছে, এ বাড়ীর সেরা ঘরখানা তার নিজের জন্যে। আসলে কিন্তু সেরা বলে রাখেনি, রেখেছে নিরিবিলি বলে। এই ঘর-খানায় পড়াশুনা করবার সুবিধে। মাঝে মাঝে খোলা ছাতটায় বই হাতে পায়চারিও করা যায়।

এই একখানা ঘর বাদ দিলে এবাড়ীর একতলা দোতলা মিলিয়ে

আর যে খান দশেক ঘর, সব সুরপতি ছেড়ে দিয়েছে আত্মীয়স্বজনদের। তারাই সবখানি জায়গা জুড়ে আছে, চেঁচামেচি করছে, ঝগড়া করছে। মাঝে মাঝে ঝন ঝন আওয়াজ ওঠে, বাসন পড়ে, কাঁচ ভাঙে। বই পড়তে পড়তে তিনতলায় সুরপতির ভ্রূ দু'টো শুধু একবার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তার বেশি না।

ঘরে ফিরে সুরপতি বইগুলো রাখলো শেলফে। গলার চাদরটা আলনায়, ছাতাটা দরজার কোণে। তারপর হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো। ওপরের ধোপদুরস্ত মিহি লংক্লথের পাঞ্জাবির নিচে বগলের কাছে বিসদৃশ ছেঁড়া গেঞ্জি ঘামে চপ্‌চপে। সুরপতি একবার অসহায় ভাবে সিলিংয়ের দিকে তাকালো, যেখানে হুকটা শূন্য। একটা পাখা থাকলে বেশ হ'ত। সুরপতি তাকালো একবার, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই নিজেকে তিরস্কার করতে হ'ল। সেটা কি চরম স্বার্থপরতা হ'ত না। তবু তো সে তিনতলার ঘরে আছে, বেশ আছে। এখন, এই বিকেলটাতে গরম লাগছে, একটু পরেই ফুরফুরে হাওয়া বইতে শুরু করবে। কিন্তু যারা নিচে আছে, দোতলায় কিম্বা একতলায়, তাদের তো গরম আরো অসহ্য।

উঠে বাইরের ছাতে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখলে অনুপমা চা জলখাবার নিয়ে এসেছে।

তৃপ্ত, কৃতার্থ একটু হাসি ফুটলো সুরপতির মুখে।

—আমি এসেছি তুমি তবে টের পেয়েছ।

—আহা, অনুপমা বললে, তোমার ওই ছাতার ঠুক ঠুক কারুর যেন শুনতে বাকি থাকে।

একটু খানি পরোটা ছিঁড়ে মুখে দিতে দিতে সুরপতি বললে, আর সবাইকে দিয়েছ।

অনুপমার মুখে সামান্য একটু ছায়া পড়ল যেন। দিয়েছি গো দিয়েছি। সবাই সবাই করেই তো তুমি গেলে।

—এ তুমি বাড়াবাড়ি করছ অনু, সুরপতি আহত কণ্ঠে বললে, কী

আর করতে পারছি ওদের জন্যে। শুধু খেতে পরতে দিচ্ছি, এই যা। এটুকুও না করলে মানুষ বলে পরিচয় দেবো কী করে।

গামছায় মুখ মুছতে মুছতে সুরপতি আড়চোখে তাকিয়ে লক্ষ্য করলে, অনুপমার শাড়িটা এখানে ওখানে ছেঁড়া। কিন্তু এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে ভরসা পেলে না। যা নরম মন অনুপমার, হয়ত কেঁদে কেটে সারা হবে।

কতকটা খাপছাড়া ভাবে, কতকটা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে সুরপতি বললে, ভেবোনা অনু, এবারকার পরীক্ষার খাতাদেখার টাকাটা পেলেই—

—অক্ষয় স্বর্গ হবে? অনুপমা কঠিন কণ্ঠে বললে।

সুরপতির আর কিছু বলা হ'লনা। একখানা বই খুলে মুখ আড়াল করলে। আজ পনেরো বছর যাবৎ এই একই উপায়ে আত্মরক্ষা করে আসছে। বেকায়দায় পড়লেই বইয়ে মুখঢাকা দেওয়া, তারপর যে যা-খুশি বলে যাক, কান না দিলেই হ'ল। বই পড়তে পড়তেই স্থির করলে, আজ সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পছন্দমত এক জোড়া শাড়ি কিনে আনবে অনুপমার জন্যে।

অনুপমা আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু'চার কথা কী বলেছিল, সুরপতির কানে যায়নি। কিন্তু মেজের থপ থপ করে চলে যাবার জানান্‌টা কানে এলো ঠিক। সেদিকে তাকিয়ে থেকে সুরপতি আপন মনেই একটু হাসলো। পনেরো বছর বিয়ে হয়েছে, অনুপমাকে বোঝা গেলনা আজও। বাড়িতে এই যে এত লোক থাকে, অর্থাশ্রিত, আত্মীয়,—এদের অনুপমা যে খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু জোর গলায় প্রতিবাদও করেনি। যদি অনুপমা কোনদিন বলত, থাকো তুমি এদের নিয়ে আমি চল্লুম, তবে সুরপতির কাছে অন্ততঃ তার অন্তরের অন্তস্তল অবধি স্পষ্ট হয়ে যেত। ভাবতো, ছোট মন অনুপমার, যে উদারতা মানুষকে মহত্ব দেয়, তা থেকে অনুপমা বঞ্চিত। হয়ত ওর অন্তর্দৈন্যের জন্যে একটুখানি অনুকম্পা বোধ করাও

চলত। কোন দিন অনুপমা এতটুকু কথা বলেনি। সোৎসাহে সুরপতির সমস্ত প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মুখে যে ছায়া ঘনাতো, তা মুছে ফেলতে পেরেছে কি। বোধ হয় না। স্পষ্টই বোঝা যেতো, অনুপমা হাঁপিয়ে উঠছে। সঙ্গীতের ক্ষান্তি নেই, কিন্তু সঙ্গত করতে করতে তবলচীর আঙুলগুলো যেন আড়ষ্ট হয়ে এসেছে; কোথায় যেন ক্লান্তি পুঞ্জীভূত।

প্রথম যখন অনুপমা এ বাড়িতে আসে কতই বা বয়স তখন ওর। সেবারেই বোধ হয় বি, এ, পাশ করলো। সুরপতিও এম, এ তে প্রথম হলো সেবারেই। রেকর্ড নম্বর ছিল, অন্ততঃ অনুপমার পরিবারে সবার আশা ছিল সুরপতি এবারে উঁচু গোছের সরকারি কাজের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেবে। অনঙ্গ—অনুপমার দাদা এবং সুরপতির সহপাঠী—সেবারেই বুঝি আধুনিক ব্যবসায় বিজ্ঞান শিখতে রওনা হয়ে গেল মাসাচুসেট্‌স্ না কনেক্‌টিকাটে। অনঙ্গ নিচের দিকে একটা সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছিল। অনুপমার বাবার তখন কলকাতায় বাবে প্রবল প্রতিপত্তি। স্বাদেশিক ঝোঁক ছিল না, কেবল টাকার কথা বিবেচনা করেই ভবতোষবাবু তিন তিন বার জজিয়তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুরপতিকে তিনি বিলেত গিয়ে আইন পড়তে বলেছিলেন।

বিলেত যাবার লোভ সুরপতিরও ছিল, কিন্তু আইন পড়ার নয় শুধু দেশ দেখতে এতগুলো টাকা অপচয় করা উচিত হবে কিনা স্থির করতেই কয়েক মাস কাটলো। ইতিমধ্যে যখন মধ্য কলকাতার খ্যাতনামা বেসরকারী একটা কলেজে ইংরিজি অধ্যাপকের পদটা এক রকম অযাচিতই ওর হাতে এসে গেল, তখন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল সুরপতি।

অনুপমাকে আড়ালে ডেকে নিয়োগপত্রটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এবারে আমি কী করব।

—কী আবার করবে। জয়েন করো।

—কিন্তু তোমার বাবা যে বলছেন বিলেত যেতে—

—যেয়োনা। সংক্ষেপে বললে অনুপমা। বলে অল্প একটু হাসল।

সেই হাসিতে যেন অনেকটা ভরসা পেল সুরপতি। অনুপমা ওর পাশে আছে ঠিক। ভবতোষবাবুকে গিয়ে জানালে, সে বিলেতে যাবে না। প্রোফেসরি করব ঠিক করেছি।

—প্রোফেসরি? এক মুহূর্ত্ত ভ্রূ কুঁচকে নীরব হয়ে চেয়ে রইলেন ভবতোষ। মাইনে কত পাবে ভেবে দেখেছ?

—দেখেছি, বললে সুরপতি।

—তা হলে আমার আর বলবার কিছু নেই। যদি পারো তবে অন্ততঃ ঘরে বসে এখানকার ল-কোর্স টাই না হয় পড়ে ফেলো।

তাও পড়ল না সুরপতি। ঘরে বসে সে রিসার্চের পেপার তৈরী করতে লাগল। শুধু এম, এ, টা চোখে কেমন ন্যাড়া লাগে।

আর সেই সময়ই সুরপতি অনুপমাকে এ বাসায় নিয়ে এসেছিল, দুঃসাহসই বলতে হবে, কেননা তখন ওর মাইনে ছিল মোটে দেড়শো।

সেদিনকার দারিদ্র্যের দিনে এই একটি মেয়ে উজ্জ্বল মুখে এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল, একথা ভাবতেও ভালো লাগে। বড়ো ঘরের মেয়ে, কে জানে, কত স্বপ্নই নাজানি ছিল অনুপমার। সবে গড়ে-ওঠা দক্ষিণ শহরতলীতে আরামে গড়িয়ে যাওয়া জীবন? আলমারি বোঝাই শাড়ির রঙে রঙে রামধনু? অনুপমা কোন দিন বলেনি।

নন্দলাল মল্লিকের গলির এ বাসায় পা দিতে দিতে যারা এগিয়ে এসেছিল ওকে বরণ করতে, তাদের দিকে অনুপমা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, একথা স্পষ্ট মনে আছে।

সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বললে অনুপমা, সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়ে গেল; কেবল রাত্রে শুতে এসে জিজ্ঞাসা করল সুরপতিকে, এরা কারা বলো তো। আলাপ করলাম, কিন্তু সবাইকে তো চিনতে পারলাম না।

সুরপতি যথাসাধ্য পরিচয় দিতে বসল: ওই যে মাঝ-বয়সী ফর্সা-মতন বিধবা যাকে দেখলে তিনি হ'লেন আমার নিরুদি।

—তোমার দিদি?

অপ্রতিভ ভাবে ঢোক গিলে সুরপতি বললে, আমার দিদি, মানে, ঠিক আপন দিদি নয়, তবে কিনা, আপন দিদিরও বেশী। অর্থাৎ আমার বাবা যখন পোস্ট মাস্টার ছিলেন নন্দীগ্রামে, তখন—

—বলতে হবেনা, বুঝেছি। আর মাথায় টাক-পড়া বুড়ো মতন ওই যে—

—আমার বসন্তকাকা। অর্থাৎ আমার বাবার—

—আর অর্থ করতে হবেনা। অনুপমা হেসে বলল,—এঁরা বিয়েতে এসেছেন ?

—বিয়েয় ? হ্যাঁ তা এসেছেন বৈকি। বিয়েয় তো এসেছেনই। কী জানো, ওরা সব আমারই আপনার লোক কিনা, এখানেই থাকেন।

—এই বাসাতেই ?

সুরপতি ঘাড় কাৎ করলে।

—ও।

স্পষ্ট বোঝা গেলনা অনুপমা খুশি হয়েছে কিনা। দু'জনকে নিয়ে নীড় রচনার যে স্বপ্ন ছিল, তা বুঝি এত লোকের কিচিরমিচিরে ভেঙে গেছে। বিলিতি ধরণের পরিবার ওদের, সংসার বলতে স্বামী-স্ত্রী আর দু'একটি ছেলে মেয়ে বোঝে।

গলাটা পরিষ্কার করে সুরপতি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করল,— আমাদের বাঙালী সমাজ ব্যবস্থা, বুঝলে, অনেককে নিয়ে। অসংখ্য ডালপালা লতা নিয়ে যেমন বনস্পতি—

সব শুনল অনুপমা। সবশেষে সংক্ষেপে শুধু মন্তব্য করল,—ও।

কিন্তু শুধু নিরুদি আর বসন্তকাকাই তো নয়। এ বাড়িতে থাকে নিরুদির ছেলে প্রমথ, ইস্কুলে পড়ে। আরেক পিসতুতো বোন, যার স্বামী স্বদেশী করে জেলে গেছে, রমা ; তার কোলের মেয়ে। খুড়তুতো ভাই নীলু, যে ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা ব্যবসার ফেলিওরের স্তম্ভের ওপর সাকসেসের সৌধ নির্মাণ করছে। এরা সবাইতো সুরপতির আপন, কাউকেই তো ফেলা যায় না। সবাই এসেছে একে একে, আস্তে আস্তে

ওর ছোট্ট বাসাটি কখন কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে, সুরপতি নিজেও লক্ষ্য করেনি। করলেও ভালোই লেগেছে। নিকট-দূর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সে-ই একমাত্র কৃতী পুরুষ, তাকে কেন্দ্র করে এমনি একটা সম্পর্কের সৌরমণ্ডল গড়ে উঠেছে, একথা ভাবতেও ভাল।

তখন ছিল সস্তার দিন, তবু মাসের প্রথমে অনুপমার হাতে মোটে একশটি টাকা তুলে দিতে কী সংকোচই না হত। বাকি পঞ্চাশটাকার গোটা কুড়ি-টাকায় সুরপতির চলত জলখাবার আর হাত খরচ; আর ত্রিশটাকার কিছু যেতো বইয়ের দোকানের পুরানো দেনা শোধ করতে, কিছু কিছু নতুন বই কিনতে। আশ্চর্য, সেই সামান্য টাকায় অনুপমা চালিয়ে নিতোও ঠিক। অনেক লোক বোঝাই সংসারের নৌকোখানা এক একবার টলোমলো করত, পাকা মাঝি আছে হাল ধরে। মাঝে মাঝে তবু সুরপতির কী অপরাধী মনে হত নিজেকে। বিলেত না গিয়ে ভালো করেনি।

থীসিস সাবমিট করবার পর নিজের চেষ্টাতেই একটা টুইশান জুটিয়ে নিয়েছিল, ষাট টাকা, সপ্তাহে দুদিন। বাড়তি রূপোর ঠিকরে-পড়া আলোয় উদ্ভাসিত হল অনুপমার মুখ। সেবার পূজোয় ঠিক হল, ওরা যাবে বেশিদূর কোথাও না, মধুপুরে।

খানিকটা ইতস্ততঃ করে সুরপতি বলেছিল, কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

—কোন্‌টা? বাক্স সাজাতে সাজাতে অনুপমা জিজ্ঞাসা করেছিল।

—এই—এই আমাদের দু'জনের এভাবে যাওয়া। মানে নিরুদি ওরাও তো রয়েছেন, ওদের এ ভাবে ফেলে যাওয়া—

—সবাই মিলে যাওয়া কি খরচে কুলুবে?

—তবে?

—তবে যেওনা। সশব্দে বাক্সের ডালা বন্ধ করলে অনুপমা।

—শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল দেওঘর যাওয়া হবে। নিরুদিও সঙ্গে যাবেন। ওঁর তীর্থ দর্শন হবে।

কিন্তু পুজোর ঠিক প্রাক্কালেই যে গৌরী বিধবা হয়ে আসবে, একথা তখন কে জান্‌ত। বসন্তকাকার একমাত্র মেয়ে গৌরী, বেশ ভালো ঘরেই পড়েছিল। ঠিক মহালয়ার দিন চোখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালো, আছাড় খেয়ে পড়ল বসন্তকাকার পায়ের ওপর।—আমার কী হবে বাবা, কোথায় যাবো এবার।

বসন্তকাকা ঘরের প্রায়ান্ধকার একটা কোণে বসে ফরসিতে টান দিচ্ছিলেন, দিতেও থাকলেন, কোনো কথা বললেন না। ইঙ্গিতে শুধু সুরপতিকে দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ সুরপতি থাকতে কারুর কোন ভাবনা নেই। উপরে আছেন জগদীশ্বর, নিচে এই সুরপতি।

পুজোয় আর কোথাও যাওয়া হ'লনা।

ডক্টরেট পেতে কী রকম খুশি হয়েছিল অনুপমা এখনো মনে আছে। এতদিন শুধু ছিল এম, এ'—এবারে যুক্ত হ'ল আরো তিনটে অক্ষর: পি, এইচ, ডি। অনুপমা নিজেই এবারে সুরপতির নামে কার্ড ছাপিয়ে নিয়ে এলো। ভবতোষবাবুও খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তবু জনান্তিকে মন্তব্য করেছিলেন মেয়ের কাছে: যদি এর সিকি পরিশ্রম করেও আইনের পরীক্ষাটা দিতো!

আইন? শুনে সুরপতি হাসলো শুধু। কেন, এই বে-আইনি ডিগ্রী-গুলোর মর্য্যাদাই বা কম কী। নামডাকওয়ালা একটা মিশনরী কলেজ থেকে ইতিমধ্যেই একটা লোভনীয় আমন্ত্রণ এসেছে, ইংরিজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদটা সেখানে সম্প্রতি খালি। শুরু আড়াইশো-য়।

স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখা যাবে এবার। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় আড়াইশো টাকা কিছু না। অনুপমারই দাদা অনঙ্গ মার্কিনমুলুক থেকে ফিরে এসেইতিমধ্যেই দু'টো যৌথ কোম্পানী আর একটা ইন্‌সিওরেন্সের কর্ণধার হয়ে ওর দুনো মাইনের কত চাকর রেখেছে। তবু মাথাটা উঁচু রেখেছে সুরপতি। কেননা, পথটা তার সৎ, বৃত্তিটা মহৎ।

সেই বছরই অনুপমার কোলে এলো সোম। আরো দু'বছর পরে কণা।

প্রথম প্রথম একটু রোমাঞ্চ হ'ত বটে, অনুপমার কোলে নবজাতককে দেখে সহর্ষ বিস্ময়ে সুরপতি ভাবতো এ কি তারই আত্মজ। কিন্তু ধীরে ধীরে এ অনুভূতিও রইল না। সংসারে ইতিমধ্যে শুধু এই দুটি লোকই বাড়েনি, নিরুদ্দির এক জা এসেছেন ছেলেপুলে নিয়ে। বসন্তকাকা আরো অথর্ব হয়ে পড়েছেন, তাঁর অসুখ-বিসুখে খরচ লেগে আছেই। আফিমের মাত্রাও বাড়িয়েছেন তিনি, সেজন্যে উপরি কিছু দুধের খরচ আছে।

এই পরিবেশে সোম আর কণাকে আলাদা করে নিজের কিছুতেই ভাবতে পারতো না সুরপতি। আরো পাঁচজন যেমন আছে, ওরাও তাদের সঙ্গে মিলে মিশেই মানুষ হোক। ওরা সুরপতির আলাদা করে কেউ নয়, এই পরিবারের সন্তান; একটি অখণ্ড সত্তার ভগ্নাংশ।

অনুপমাএকদিন বললে, দাদাকে আমি কাল খেতে নেমন্তন্ন করেছি।

—করেছ? খুশি হয়ে সুরপতি বললে,—বেশ তো খুব ভাল কথা। অনঙ্গ আসবে কখন?

—সন্ধ্যার পর। দেখ, দাদা বলছিল, তোমাকে ইন্‌সিওর করতে।

কৌতূহলী হয়ে বসল সুরপতি।—কী ব্যাপার বলো তো।

—বেশি কি আর, তোমাকে দু'টো পলিসি করতে হবে, পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার, খোকা আর খুকুর নামে।

—খোকা আর খুকুর নামে? সুরপতির ভ্রূ সামান্য কুঞ্চিত হল।—হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়। এ সংসারের এই তো হাল দেখছি, একটা পয়সাও জমে না। ওদের দু'জনের ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে। শেষ পর্যন্ত ওরা ভেসে যায় যদি—

—ওদের ভবিষ্যৎ, সুরপতি ধীরকণ্ঠে বললে,—ওদের নিজের হাতে, আমাদের নয়। আর দশটা ছেলেমেয়েও এ বাড়িতে যেমন সুখে দুঃখে মানুষ হচ্ছে, ওরা তেমনি হোক্ না। কেবলমাত্র একটা জন্মের একসিডেন্টের জোরে পাঁচজনের চেয়ে ওরা প্রেফারেন্‌সিয়েল ট্রিটমেণ্ট পাবে, এটাকে আমি ঘোরতর ইমরাল মনে করি অনু।

সুতরাং পরের দিন অনঙ্গ এ বাড়ী এসে ঘণ্টা দুই গল্প করে গেল; আজব দেশ আমেরিকার আজগুবি কেচ্ছা বলে তাজ্জব করে দিলে সবাইকে, সর্বশেষে আসনপিঁড়ি হয়ে খাবার বিবিধ অসুবিধের উল্লেখ করলে, কিন্তু সুরপতি পলিসি করলে না।

সেই ঘটনার পর যদি বেঁকে বসত অনুপমা, তা হলে সুরপতি হয়ত কিছুটা শুধরে যেতো। কিন্তু নিজেকে যেন আরো গুটিয়ে নিলে অনুপমা। স্পষ্টই বোঝা যায় সে পছন্দ করছেনা সুরপতির এই উদারতার ঢাক-পেটানো বাড়াবাড়ি। একটুখানি সুখলিপ্সা, হাত-পা-ছড়ানো আয়েসের লোভ আছে অনুপমার, তাকে স্বার্থপরতা বলা অবিচার।

অনুপমা হয়ত বলতে চাইতো, যারা আছে তারা থাকুক না, কিন্তু তাকে সুরপতিকে খোকাকে আর খুকিকে নিয়ে স্বতন্ত্র একটা কোণ তৈরি হোক না কেন, ঈষৎ উঁচু একটা বেদী। আর সবাই আশ্রিত আর সে আশ্রয়দাত্রী, একথা অনুপমা কিছুতে ভুলতে পারতো না।

সুরপতি কি আর বোঝেনি। বুঝেছে সব। কিন্তু যে ব্যবস্থা বহাল আছে তার নড়চড় হতে দিতে তার মন সায় দিতো না। রোজগার আরো কিছু বেড়েছিল। মাইনে হয়েছিল তিনশো। পরীক্ষার খাতা দেখে মিটতো সারা বছরের ঘাটতি। এ ছাড়া বেনামিতে বাজার-চলতি নোট্ লেখার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল। জুটেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারসিপ। কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে প্রয়োজন, চড়েছে জিনিষ-পত্রের বাজার।

ছোট খাটো কত শখ ছিল অনুপমার। শোবার-বসবার-খাবার ঘর থাকবে আলাদা আলাদা; পছন্দসই আসবাবে সাজানো। সপ্তাহে একটি দিন অন্তত সিনেমায় যাওয়া। তখন আর কী-ই বা বয়স অনুপমার।

সুরপতি বলেছে,—সে কি হয়। তুমি বরং গৌরীকে নিয়ে যাও। আহা বেচারী, বিধবা হয়ে এসেছে, ওর একটু মন ভালো থাকা দরকার।

—গৌরীকে নিয়ে? চোখের মণি দু'টো চকিতে জলে উঠেছে অনুপমার—থাক তবে।

অর্থাৎ খাওয়া-পরার দায়িত্ব তো নিতে হয়েছেই এর ওপর আবার মন ভালো করার দায়িত্বও নিতে হবে? অমন সিনেমায় গিয়ে কাজ নেই।

—কী হ'ল? বই থেকে মুখ না তুলেই সুরপতি জিজ্ঞাসা করেছে।

—কিছু না। জবাব এসেছে কানে।

গৌরীকে নিয়ে কিছু কি সন্দেহ করতো অনুপমা? কে জানে। সাবধানী মেয়ে অনুপমার মনের নিচের মহলে কী ঘটছে ওপর থেকে বোঝা যেতো না। তবু সুরপতির কেমন যেন মনে হ'ত, অনুপমা ওকে লক্ষ্য করছে, বসন্ত কাকার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গৌরীর সঙ্গে দু'একটা হাসি ঠাট্টা করেছে যদি, অনুপমা এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির মুখে। সুরপতির অস্বস্তি লাগত, গ্লানি বোধ হ'ত। কিন্তু ছোট মন বলে অনুপমাকে তিরস্কার করতেও বাধতো। অস্বীকার করে লাভ নেই, সেই সময়ে, অল্প ক'দিনের জন্যে, একটা দুর্বলতা এসেছিল মনে। আশ্রয় দানের বিনিময়ে একটা বিধবা মেয়ের কাছ থেকে সুবিধে আদায় করে নেবে, তেমন কাপুরুষ সুরপতি নয়, কিন্তু তবু গৌরীর সান্নিধ্য ভালো লাগত। আর সেই সান্নিধ্যের সুযোগ করে দিতেন বসন্তকাকাই।

আশ্চর্য এই লোকটি। ক্ষীণ একটু সম্পর্কের সুতো ধরে এ বাড়িতে এসে উঠেছেন। একটা ধূম্রলোক রচনা করে রেখেছেন নিজের চারপাশে। কথা বলতেন অল্প। আর বলতে হ'তও না, কেননা প্রয়োজন মত সব উপকরণ হাতের কাছেই পেতেন তিনি। হয়ত এই বন্দোবস্তটা কায়েমি করবার জন্যেই মাঝে মাঝে মেয়েকে ওপরে পাঠাতেন নানা ছুতোয়,—সকাল বেলা আদ্যোপান্ত পড়া খবরের কাগজটাই হয়ত সন্ধ্যাবেলা আবার চেয়ে পাঠাতেন।

আরেকটি লোকের সঙ্গে গৌরীর অলক্ষ্য একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত,—নিরুদির। দু'জনেই আশ্রিত। কিন্তু একে অপরকে সহ্য করতে পারত না। অনুপমা আসবার আগে এ সংসারে নিরুদিরই ছিল একাধিপত্য; অনুপমার কাছে হার মানতে হয়েছে তাকে, কিন্তু তার জ্বালা যেন মেটাতে চাইছেন গৌরীর ওপর দিয়ে।

গৌরীকে নিয়ে বিশ্রী সব ইঙ্গিত করতেন নিরুদি। কলতলায় কাপড় কাচতে কাচতে শুনিয়ে শুনিয়ে যে সব কথা বলতেন তার দু'একটা ছিটকে এসেছে সুরপতির কানেও।

এমন কি নিজের ছেলে প্রমথকেও বাদ দিতেন না। কতই বা বয়স তখন প্রমথর। সবে ম্যাট্রিক দিয়েছে, গোঁফের ক্ষীণ রেখা উঠেছে। লুকিয়ে ম্যাটিনীতে দেখে আসা বিলিতি ছবির গল্প শোনাতো বিমুগ্ধ গৌরীকে। দু'জনে লুডো খেলত।

একদিন প্রমথকে কী মারটাই মারলেন নিরুদি। একটা চাল ফিরিয়ে নেবার জন্যে প্রমথ বুঝি হাত চেপে ধরে সাধ্যসাধনা করছিল গৌরীর, সেই অবস্থাতেই তাকে নিরুদি দেখে ফেলেছিলেন। মার শেষ করে ছেলেকে সদর দরজা দিয়ে বার করে দিয়ে সেদিন নিজেও কিছু খেলেন না, কিন্তু কলতলায় বসে শব্দভেদী শর যোজনা করতে থাকলেন যথা-রীতি। সোয়ামী খেয়েও সাধ মেটেনি গৌরীর, তাঁর দুধের ছেলের মাথা খেতে বসেছে, ইত্যাদি। গৌরীও কিছু আরেক গাল পেতে দেবার পাত্রী নয়। তার জবাবও এসেছে ঘরের ভেতর থেকে, ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে। নিরুদির অতো সতীপনা ফলাতে হবেনা। কী দোষে স্বামী পরিত্যাগ করেছিলেন নিরুদিকে সে কথা আর কেউ না জানুক গৌরীর জানতে বাকি নেই।

মাথা হেঁট করে নিজের ঘরে বসে সুরপতি শুনছিল সব। অনুপমা বসে ছিল পাশে। ওর চোখ মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে, স্পষ্টই বোঝা যায়।

—কী ইতর এরা। বলোতো এখুনি ঘাড় ধরে বার করে দিই দু'জনকে।

—থাকনা, অনেকক্ষণ পরে সুরপতি জবাব দিয়েছিল,—থাকনা। কোথায় যাবে? আমরা কান না দিলেই হ'ল।

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে অনুপমার মুখে।—আমি জানতুম্। তুমি পারবে না। প্রাণ গেলেও তাড়াতে পারবে না।

কিন্তু খুড়তুতো ভাই নীপুর কাছে গৌরীর লেখা চিঠি যেদিন ধরা

পড়ে গেল—নিরুদিই চিঠিটা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন অনুপমাকে—সেদিন সুরপতিও ভেবেছিল, কাজ নেই আপদ রেখে। মনস্থির করে বসন্তকাকার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তিক্ত কয়েকটা কথা শানিয়ে রেখেছিল রসনাগ্রে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয়নি। সেইদিনই বুঝি বসন্তকাকার হার্টের ট্রাব্‌ল্‌টা বেড়ে গেল। দিন তিনেক যাকে বলে যমে মানুষে টানাটানি চলল। এক টানা বাপের শিয়রে বসে ক্লান্তিহীন শুশ্রূষা করে গেল গৌরী। বসন্তকাকা যখন সেরে উঠলেন তখন মন থেকে সব তিক্ততা সুরপতির মুছে গেছে। গৌরীর সেবারত হাত দু'খানির দিকে চেয়ে থেকে থেকে বিস্ময়ে মন ভরে উঠেছে, কিছু বলা হয়নি।

জীবনে আর দু'টো অনুরোধ করেছিল অনুপমা। খোকা সেবারে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে। অনুপমা ওর জন্যে আলাদা একটা মাষ্টার ঠিক করতে বলেছিল।

—তুমি তো ওকে মোটেই দেখনা, পড়াশুনাও ভালো হয়নি ওর। এটা পরীক্ষার বছর, একজন টিউটর রেখে দিলে—

—সে হয়না। এ বাড়ি থেকে এর আগে নীপু পরীক্ষা দিয়েছে, কারুর বেলা টিউটরের প্রয়োজন হয়নি, খোকার বেলা রাখলে লোকে বলবে কী।

—আর খোকা ফেল্‌ করলেই বুঝি লোকে তোমাকে খুব ভালো বল্‌বে?

—ফেল করলেই বা কী। আমি তো পুত্রনামধন্য নই অনু। স্বনামধন্য।

মেয়ের জন্যে গানের মাষ্টার রাখার প্রস্তাবও এই ভাবেই সুরপতি উড়িয়ে দিয়েছে।

—তুমি শেখালেই পারো।

—আমি? বিয়ের পর ওসবের চর্চা করবার অবসর পেলাম কই। সংসারের খাটুনি খেটেই ফুরসুৎ পাইনে—

—সত্যি অনু, সহানুভূতির কণ্ঠে সুরপতি বলেছে, আমার হাতে পড়েই তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। অন্য কেউ হলে—

—ও কথা বোলো না। অনুপমা বাধা দিয়ে বলেছে, আমার মতো ভাগ্য হয়না শুধু—শুধু তুমি যদি একটু স্বাভাবিক হতে!

খোকা তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছিল।

পরীক্ষার ফল ছাপানো গেজেটটা সুরপতির হাতে দিয়ে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অনুপমা। একটি কথাও বলেনি। কিন্তু তার চোখের ভাষা পড়ে নিতে ভুল হয়নি সুরপতির। সব কিছুর জন্যে সে সুরপতিকেই দায়ী করছে সন্দেহ নেই। একবার সুরপতি শুধু শিউরে উঠেছিল: সব অবিচার যেন মনে মনে তুলে রাখছে অনুপমা, একদিন সুযোগ পেলে সুদে আসলে সব কিছুর শোধ নেবে।

কিন্তু অনুপমা সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা দিয়েছে এই সেদিন, নীপুর বিয়ের ব্যাপারে।

অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে বড়ো রকমের একটা লোকসান দিয়ে নীপু দিন কতক গা-ঢাকা দিয়েছিল। সুরপতি বিশেষ বিচলিতও হয়নি। জানতো, নীপু ফিরে আসবে।

এলোও ঠিক। রাত দশটার সময় সুরপতি নোটের পাব্লিশারের বাড়ি থেকে ফিরছিলো, বাসার সম্মুখে এসে দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে—

—আরে এ যে নীপু।

নীপু উঠে দাঁড়ালো। মাথা তার তখনো নীচু।

—কোথায় গিছলি, কবে এলি, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন—একসঙ্গে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলে সুরপতি।

—বলছি দাদা, তুমি একটু এদিকে এসো। বিস্মিত সুরপতিকে টেনে নীপু গলির মুখে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সব কথা বলেছিল ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে। সবশেষে নীপু বললে, বিশ্বাস করো দাদা, এ বিয়ে না করে আমার উপায় ছিলোনা। আইন যাই বলুক, ন্যায়ের চোখে আমি বাধ্য ছিলাম—

হেঁয়ালির মত লাগছিল নীপুর কথা। বোকার মতো সুরপতি প্রশ্ন করেছিলো, অর্থাৎ ?

অনেক ইতস্ততঃ করে নীপু বলেছিল, মেয়েটি আমাকে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করেছিল—মানে আর মাস তিনেকের মধ্যে—

—থাক আর বলতে হবেনা, সুরপতি বললে,—বুঝেছি। মেয়েটি এখন কোথায়।

সসঙ্কোচে নীপু বলেছে, আছে সামনের এই পার্কটায়। ওকে আমি বসিয়ে রেখে এসেছি দাদা।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নীপু,—ধমকের সুরে সুরপতি বলেছে,—এই হিমের রাতে ওকে খোলা পার্কে ফেলে এসেছিস ? সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারিসনি হতভাগা ?

—আজকে ? নীপু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছে।

ততক্ষণ নিজেই সুরপতি এগিয়ে গেছে।

—বৌদি কী ভাববেন ?

—সে ভাবনা আমার।

ওদের তিনজনকে দরজা খুলে দিতে এসে অনুপমা এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে সুরপতিও একটু বিচলিত হয়েছে বৈকি।

কিন্তু সীমা আনত হয়ে প্রণাম করতেই অনুপমা তাকে চিবুক স্পর্শ করে তুলে ধরেছে,—থাক থাক ভাই। এসো। বাড়ি শুদ্ধ লোককে জাগিয়ে নিজেই শাঁখ বাজায়।

সুরপতি মনে মনে অবাক মেনেছে।

নীপু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছে, আমার যেন কেমন কেমন লাগছে দাদা। বৌদি ঠিক রাগ করেছে।

সুরপতি বলেছে—বটে, তোর বৌদিকে এখনো চিনিস নি। কিন্তু নীপুর আশংকাটা তার কাছেও অমূলক মনে হয়নি। এতটা বাড়াবাড়ি যেন ঘাড় ধরে বার করে দেবারই অন্তরূপ।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো সুরপতি। সোম তখন ঢুকছে। উস্‌কো খুসকো চুল, আধময়লা পাঞ্জাবি, সুরপতিকে দেখে সোম একপাশে সরে দাঁড়ালো।

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, এই ফিরছিস ?

সোম জানালে হাঁ। আর কোন কথা হ'লনা। থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করে সোম আর পড়েনি, কিম্বা অনুপমাই তাকে পড়তে দেয়নি। আজকাল অনন্তর একটা ফার্মে কেরানীগিরি করছে সোম, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে। এত লোকের ভিড়ে ছেলের সান্নিধ্য কোন দিনই ভালো করে পায়নি সুরপতি, আজকাল তো দেখাশোনাই কালে-ভদ্রে। এই যে ওকে দেখে সোম সরে দাঁড়ালো, এর ভেতর, সুরপতির মনে হয়ত পিতার প্রতি চিরাচরিত সমীহই শুধু নেই একটা নালিশও আছে যেন। যদি ছেলের একটু যত্ন নিতো সুরপতি, অনুপমার কথামত অন্ততঃ টিউটর রাখতো একটা, তা হলে হয়ত আজ সোম কৃতী ছাত্র হ'ত একজন, অপরিণত বয়সে কেরানীগিরির যাঁতাকলে পড়তে হ'ত না।

সুরপতির প্রতি চিরস্থায়ী ক্ষতের অভিযোগ আছে সোমের, আর সেই অভিযোগে বুঝি ওর মায়েরও সমর্থন আছে।

আর কণা। যাকে মাষ্টার রেখে অনুপমা গান শেখাতে চেয়েছে। আজকাল ওর মুখে অনুপমার অল্প বয়সের হুবহু ছাঁদ আসে। কিন্তু অনুপমা থাকতো ফিটফাট, কলেজে যেতো বেনী দুলিয়ে, খুট খুট গোড়ালির শব্দে দুলিয়ে দিত বুক। আর কণা ? মেয়েটা ভালো করে সাজতেও শেখেনি। সাজগোছ করার উপকরণও জোটেনি এই শেয়ারের বাড়িতে। ওর স্বাভাবিক ফর্সা রঙও যেন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। বাপের প্রতি মেয়েদের সহজাত একটা আকর্ষণ থাকে, সেই টানে মাঝে মাঝে মেয়েটা অকারণে এসে দাঁড়াতো সুরপতির পড়ার টেবিলের কাছে ; উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে কতদিন ফিরে গেছে ঠোঁট ফুলিয়ে।

রাস্তায় নেমে সুরপতি স্থির করলে, মেয়েটার জন্যেও যাহোক একটা কিছু নিয়ে যেতে হবে,—স্নো, পাউডার কিম্বা এসেন্স।

সারাটা সন্ধ্যাই সুরপতি অন্যমনে রাস্তায় বেরিয়েছে কিনা বলা যায়না। অনুপমার জন্যে শাড়ি কিনেছে ঠিক, তারপর নিজের সমদর্শিতা বজায় রাখবার জন্যে নীপুর স্ত্রীর জন্যে ব্লাউজ-পীস। মেয়ের জন্যেও টুকি টাকি কিনেই বিপত্তি ঘটল। এতগুলো মোড়ক দু'হাতে সামলানো ভার।

হয়ত পা পিছলে গিয়েছিলো, হয়ত মোড়ক ক'টা সামলাতে পারেনি, কিম্বা অল্প আলোয় বাসের হাতলটা ঠিক ঠাহর হয়নি। কিসের পর কী ঘটেছিল মনে নেই, একটা তীব্র চীৎকার শুধু গলা চিরে বেরিয়ে এসেছিল।

জ্ঞান হতে দেখলে নিজের ঘরেই শুয়ে আছে। চিবুকে হাত বুলিয়ে বুঝলে শ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন। কতদিন কেটে গেছে কে জানে। আরো কিছুক্ষণ কাটতে টের পেল, এতক্ষণ সে শুধু একটা চোখেই দেখছে। আরেকটা চোখ মেলতেই পারছেনা কিছুতে। ভয়ে ভয়ে সুরপতি দু' চোখই বুজে ফেললে।

দ্বিতীয়বার চোখ খুলে অনুপমাকে সামনে দেখতে পেলো। ক্লান্ত কণ্ঠে ডাকলে নাম ধরে।

অনুপমা বললে, এখন কিছু জিজ্ঞাসা কোরনা, অনেক তপস্যায় তোমাকে ফিরে পেয়েছি।

কিন্তু একে একে সব জানা গেল। সেই দুর্ঘটনার পর কেটেছে তিন দিন। জীবন বেঁচেছে, কিন্তু রয়ে গেছে অপূরণীয় ক্ষতি। শুধু একটা চোখই যায়নি। বুকের পাঁজরা ভেঙেছে, গেছে একখানা পা, সেই সঙ্গে চিরকালের মতো খেটে খাবার ক্ষমতা। তার জীবন নিয়ে একী পরিহাস বিধাতা করলেন!

ছ'মাস বিছানায় একই ভাবে পড়ে থাকতে হবে। তার পরে কাঠের পায়ে ভর করে একটু আধটু এদিক ওদিক চলে বেড়াবার অনুমতি মিলবে বটে, কিন্তু গুরুতর, বিশেষ করে, মানসিক পরিশ্রমের,—কখনো নয়।

—আমি তবে আয় খেটে খেতে পারবোনা? আর্ত চীৎকার করে সুরপতি জিজ্ঞাসা করেছিল।

বিষন্ন ভঙ্গিতে ডাক্তার ঘাড় নাড়লেন। আশা কম। তা ছাড়া উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে বরাবর। সে চিকিৎসাতেও ঢের খরচ।

—কত, আন্দাজ? মাসে অন্ততঃ তিন শো। ফিরিস্তি দেখে হিসাব করে ডাক্তার জানালেন।

যদি এই ওষুধ, এই পথ্য আর এই বিশ্রাম চালিয়ে যেতে পারেন, ডাক্তার বললেন, তবে হয়ত, হয়ত কোন দিন, বছর দু'য়েক বাদে কোন ক্রমে কর্মক্ষম হতে পারবেন।

কিন্তু সেই পথ্য-ওষুধের মাশুল যোগানো কি সোজা। দুষ্প্রাপ্য ওষুধ, চড়াদামে সংগ্রহ করতে হয়। যে চোখটাতে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি এখনো আছে, তার জন্যে নিয়মিত খাদ্যের এক রাজসিক বরাদ্দ! ছানা, মাখন, ডিম, আঙ্গুর, মাছ, দুধ, ফল, মাংস। কোথা থেকে এত চলবে?

প্রথম দু'মাস কলেজ থেকে পুরো বেতনে ছুটি পাওয়া গেল। তার পরে আধামাইনের পালা চলল কিছুকাল। সবশেষে সুরপতিকে বিনে মাইনেয় দীর্ঘ ছুটি নিতে হ'ল।

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে সামান্যই জমেছিল। আর এত বড় সংসারের কল্যাণে হাতে প্রায় কিছুই বাঁচেনি। তবু সেদিন দুপুরে অনুপমাকে ডেকে সুরপতি হিসাব করতে বসল। মনে বুঝি ক্ষীণ আশা ছিল, কে জানে অনুপমার হয়ত গোপন তহবিল আছে একটা, লক্ষীর ঝাঁপি উপুড় করলে কোন না হাজার বয়েক টাকা বেরুবে।

অনুপমা যখন জানালে কিছুই নেই, তখন সুরপতিরও মুখ কালো হয়ে এলো।

—কিছুই নেই?

—কিছুই নেই।

—উপায়? তাও নেই নাকি। তাকি আর নেই। সুরপতির লেখা নোট থেকে এখনো মাসে শ'খানেক টাকা আসতে পারে, অবশ্য ঠিক

মত তত্ত্বাবধান যদি হয়। আর বই বিক্রিরও একটা মরশুম আছে, সেটা এখন নয়। তবে ?

তার পরেও একটা তবে আসে বৈ কি। অনুপমা বি-এ পাশ করেনি ? অবশ্য সব ভুলেছে, কিন্তু ডিগ্রীটা তো মুছে যায়নি। অনুপমা চাকরি নেবে একটা। আর কিছু না জুটুক, মাস্টারি তো সহজলভ্য।

তুমি চাকরি করবে অনু ? সুরপতি প্রতিবাদ করছিল প্রথমে, কিন্তু সে প্রতিবাদ তার স্বরের মতোই ক্ষীণ। আর কীই বা উপায় আছে। অনুপমার মতো অহংকারী মেয়ে দাদাদের কাছে হাত পাতবেনা, এটা ঠিক।

এতদিনে সংসারের পূর্ণ কর্তৃত্ব পেয়েছে অনুপমা। সে সুরপতির স্ত্রী মাত্র নয়। প্রমাদ গণলেন নিরুদি-বসন্তকাকা-গৌরী-নীপুর দল। এতদিন অনুপমা শুধু প্রতীক্ষা করেছে, আঘাত করার সুযোগ এসেছে আজ। সমস্ত বাড়তি জঞ্জাল এবার দূর করবে।

সুরপতিও তাই ভেবেছিল। নোট লেখার টাকা ঠিক মত আসছে না. কোন মাসে ষাট, কোন মাসে চল্লিশ, কোন মাসে বা পঁচিশ। সোমের মাইনে বেড়েছে, সে আনছে পঞ্চাশ টাকা। আর অনুপমার একশো পঁচিশ।

কত হ'ল ? দুশো-কি-সামান্য বেশি। সুরপতির চিকিৎসার খরচই যে তিনশো। তবে ?

মেজাজ খিটখিটে হয়েছে সুরপতির। সকাল থেকেই চেঁচামেচি শুরু করে। গ্লুকোজ কই আমার ?

নীপু-ঠাকুরপোর ছেলের অসুখ। তাকে দিয়েছি। অনুপমা বললে।

—আর দুধ ? এত কম কেন ?

বসন্তকাকাকে দিতে হয়েছে যে। কাকার শরীরটা আজকাল ভেঙে পড়েছে দেখতে পাওনা ?

জবাব নেই। জবাবে শুধু চেঁচাতে ইচ্ছে করে, গালাগালি করতে ইচ্ছে করে।

কাকা! কাকা! গজরায় সুরপতি আপন মনে, রাবণের গুষ্ঠী এসে ঘাড়ে চেপে বসেছে। এরা তাকে সেরে উঠতেও দেবেনা নাকি। অনেক কাল তো এদের ভার বহন করেছে সুরপতি, আর কেন। উট হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়েছে, তবু কি এদের মায়া হয়না।

ওষুধ আছে তো পথ্য নেই। ছানা আছে, কমলা লেবু কই। মাছ তো এলো, কিন্তু কোথায় সকাল বেলাকার আধসেদ্ধ ডিম, ডাক্তার বাবু যা খেতে বলেছিলেন?

আর কোথায়। আনা হয়নি। টাকা নেই। অনুপমা বললে, মোটে দু'শোটি টাকা। দেখতে পাওনা এতগুলো প্রাণী—

চীৎকার করে উঠল সুরপতি, এদের খাওয়াতেই কি তুমি উদয়াস্ত খাটছ, দুপুরে বেরিয়ে টাকা রোজগার করে আনছ? ওদের তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছনা কেন অনু? সুরপতি যত চেঁচায়, তত ওর মুখ দু'হাতে চাপা দেয় অনুপমা, ত্রস্ত, চাপা কণ্ঠে বলে, চুপ করো, চুপ করো। ওঁরা শুনতে পাবেন যে! কোথায় যেতে বলব ওঁদের। নীপু ঠাকুরপোর কাজ নেই, বৌয়ের আবার ছেলেপুলে হবে। বসন্তকাকা লাঠিতে ভর না করে এক পা নড়তে পারেন না আজকাল, কোথায় যাবেন গৌরীকে নিয়ে। আর নিরুদি···এতকাল আমাদের সংসারের জন্য এত করেছেন···

বলতে বলতে গলা ধরে এলো অনুপমার। আর সুরপতি এক চোখে আহত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। কী উদার, তবু কী হিংস্র অনুপমা, নিষ্ঠুর নিয়তির মত। এতদিনে বুঝি দিন পেয়েছে। সুরপতির খেলায় সুরপতিকে মাৎ করে প্রতিশোধ নেবে।

দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সুরপতির।

—আমার ওষুধ-পথ্য জুটবেনা, তবু ওরা এখানে থাকবে? আমি কোন দিন তা হ'লে সেরে উঠবনা? অন্ধ হয়ে যাবো?

—কী করব বলো।

ঠাণ্ডা গলায় ধীরে ধীরে বল্‌লে অনুপমা। তারপর দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নির্বিকারভাবে জ্বরের চার্টটা দেখতে লাগল।

সমান্তর

প্রথমেই বলে রাখা ভাল আমার শিক্ষা-দীক্ষা সব বিলিতি রীতিতেই হয়েছিল। বাবা ছিলেন ব্যারিষ্টার। অবশ্য ব্যারিষ্টার কথাটা এখন আর ইঙ্গবঙ্গের সমার্থসূচক নয়। কিন্তু আমার বাবা এই ঘোরতর স্বাদেশিক বিংশ শতকেও উনিশ শতকের ট্রাডিশন বজায় রেখেছিলেন। ইংরিজি ছাড়া বলতেন না, ইংরিজি খানা ছাড়া খেতেন না। চলনে বলনে পোষাকে পিকাডিলি সার্কাসের অনুকৃতির আন্তরিক প্রয়াস করে চলতেন। নিজেকে, নিজের পরিবারকে এবং নিজের মতাবলম্বীদের নিয়ে একটা ছোটখাটো উটপাখী-গোষ্ঠী রচনা করেছিলেন তিনি। আমরা মেমেদের কাছে ফিরিঙ্গি ইস্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেছি। খাটো ফ্রক পরে অনুচিত বয়স পর্যন্ত নবোদ্ভিন্ন যৌবনের অবহেলা করেছি।

যে বয়সে বাবার বন্ধুদের সামনে অনর্গল ইংরিজি কবিতা আবৃত্তি করে তাঁদের চমৎকৃত করেছি তখন পর্যন্ত বাংলায় ভালো করে নাম-সই করতেও শিখিনি।

বাংলা একেবারেই শিখবো না বাবার প্রথমতঃ এই সংকল্প ছিল; পরে কী কারণে জানি না তিনি তাঁর কড়া বিজাতীয় ঘোড়ার রাশ ঈষৎ শিথিল করেছিলেন। মেমেদের ইস্কুলে লেখাপড়া শিখলেও বাড়ীতে আমার বাংলা বর্ণ-পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু ঐ পরিচয় পর্যন্তই। বাংলা হরফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার কখনই হয়নি। বাবার সামনে বাংলা বই খুলে বসবার অনুমতি ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল, এ ভাষায় কেবল কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গ্রন্থাদি লিখিত হয়ে থাকে; যা পড়ে সরলমতি বালক-বালিকাদের কিছু শেখার চেয়ে বয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। মোটের ওপর বিশ শতকের তৃতীয় দশকেও বাবা উনিশ শতকের ইঙ্গবঙ্গী ফিরিঙ্গিয়ানার ঐতিহ্যের উত্তরসাধক ছিলেন।

ধর্ম ? ধর্ম বলে যে কোন পদার্থ আছে একথা আমি জেনেছি অনেক পরে। আদমসুমারীর কালে হয়ত হিন্দু বলেই আমাদের উল্লেখ থাকত কিন্তু ঐ উল্লেখ পর্যন্তই। বাবা কোন ধর্ম্ম মানতেন না। না যেতেন গীর্জেয়, আর ব্রহ্মোপাসকদের তো রীতিমত বুজরুক বলেই মনে করতেন।

বাড়ীতে বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতাম ইংরিজিতে, ভাই-বোনদের সঙ্গেও তাই। মা ইংরিজি বুঝতেন কিন্তু সাবলীল ভাবে বলতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গে ষাট : চল্লিশ অনুপাতে ইংরিজি-বাংলার খিচুড়ি পাকিয়ে কথা বলতাম। চাপরাশি বাবুর্চি খানসামাদের সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে।

বাংলা ? বংলাতেও কথা বলতাম বৈ কি। সে শুধু একজনের সঙ্গে। তিনি ঠাকুমা। এই অত্যন্ত বিজাতীয় বাড়ীর আবহাওয়ার মধ্যে তিনি কী করে তাঁর সাবেকি নিষ্ঠার প্রতীক ঠাকুর-ঘর নিয়ে ছিলেন আজ তা ভাবতেও অবাক্ লাগে। সব বদলেছিল, পুরনো বাড়ি ভেঙে হাল-ফ্যাসানের করা হয়েছিল, কেবল ঠাকুমা বদলাননি। ঠাকুমা আমাদের ছুঁতেন না, বাবারও কড়া নিষেধ ছিল ওদিকে যেও না। বোধ হয় তাঁ'র আশঙ্কা ছিল পূজোর ঘরে গিয়ে ফিরিঙ্গি শিক্ষার বাচ্চা হাঁস আমরা, আমাদের গায়েও হিন্দুয়ানার পাঁক না লেগে আসে। তবু আমরা ঠাকুর-ঘরে মাঝে মাঝে গেছি। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছি ঠাকুমা ঘণ্টা নাড়ছেন। মজা দেখতেই যেতাম বটে, কিন্তু ধূপ-ধূমাচ্ছন, পঞ্চপ্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় আলোকিত সেই নির্জন কক্ষে শিলামূর্তির সমুখে ধ্যানরত ঠাকুমার শুভ্র বৈধব্যের মূর্তিখানি বড় রহস্যময় মনে হত।

এত উগ্র বিজাতীয় মোহ থাকা সত্ত্বেও বাবা কেন যে আমাদের ক' ভাই-বোনকে নিয়ে বিলেত যাননি এ প্রশ্ন উঠতে পারে আশঙ্কা করে আগেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখি। নিয়ে যেতেন হয়ত। কিন্তু ইতিমধ্যে বাবার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। তাছাড়া য়ুরোপে তখন দ্বিতীয় মহাসমরের উদ্যোগপর্ব চলেছে। তাই শেষ পর্যন্ত বিলেতে গিয়ে

আমরা যে সংস্কৃতির কার্বন-কপি করছিলুম তার মূল দলিলটা আর দেখে আসা হয়নি।

গল্পের ভূমিকা এই পর্যন্ত।

নিজে অমন উগ্র বিলিতিয়ানার সমর্থক হয়েও বাবা শেষ পর্যন্ত কেমন করে যে ওর সঙ্গে আমার বিয়েতে মত দিলেন সেটা আমার জীবনে একটা রহস্য হয়ে আছে। হয়ত শেষের দিকে তাঁর রক্তের তেজ একটু শান্ত হয়ে এসেছিল, তিনি হিন্দু সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাছাড়া আরো একটা কারণ বুঝি ছিল; সেটা আমার ব্যারিষ্টার বাবার বৈষয়িক বুদ্ধির ওপর কম প্রভাব বিস্তার করেনি। আমার স্বামীর অর্থ ছিলো।

শুনেছিলেম আমার স্বামী ফিলজফিতে শেষ পরীক্ষা সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ছেলেবেলা থেকে ফিলজফি বলে শাস্ত্রের নামটুকুই মাত্র জানা ছিল, ও নিয়ে কখনো নাড়া-চাড়া করিনি। অন্যমনস্ক হয়ে দু'মিনিট বসে থাকলে এক মেসোমশাই যখন বলতেন, খুকু এক-মনে কী ভাবছে দেখ, ও ফিলজফার হবে,—তখন ফিলজফার আখ্যাধারী এক ধরণের অসামাজিক কিম্ভুত কিমাকার জীবের কল্পনা করে হাসি পেত। আমরা পড়াশুনা করেছিলুম বটে কিন্তু সীরিয়াস কিছু না। আমাদের ইংরিজিতে বুৎপত্তি ছ'পেনি দামের থ্রিলর পড়তে, এবং নিখুঁৎ ঢঙ্ে মার্কিণ চিত্রতারকাদের অনুকরণ করতে করতেই ফুরিয়ে যেতো। দাদার একটু কল-কারখানার দিকে ঝোঁক ছিল। সে পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেল।

বিয়ের আসরে যাঁকে স্বামী বলে সমুখে এনে হাজির করা হ'ল, তার চেহারা দেখেই মনে-প্রাণে জ্বলে উঠলুম। চেহারাটা এমনি তার মন্দ নয়। রঙটা বিলিতি চশমাপরা চোখে হয়ত তেমন ফর্সা ঠেকল না, কিন্তু তাতে উজ্জ্বল আভা আছে। কিন্তু গায়ের রঙ যা স্বাভাবিক সেইটেই মানুষের কাছে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জাহির করতে হবে কেন, একটু প্রসাধনে তাকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে আপত্তি কী, অন্ততঃ

বিয়ের রাতে? সব চেয়ে আশ্চর্য তার পোষাক। খদ্দরের পাঞ্জাবি, মায় উড়ুনীটা পর্যন্ত খদ্দরের। তাছাড়া চুলেরই বা কী ছিরি! আগা-গোড়া সমান করে ছাঁটা, মাঝখানে ছোট একটা সীঁথি। পুরুষ-মানুষের ব্যাকব্রাশ ছাড়া অন্য কোন রকম করে আঁচড়ানো চুল আমার পছন্দ হত না।

শুভদৃষ্টির সময় ওর চোখে কী ছিল জানি না, কিন্তু আমি পলকেই বুঝে নিয়েছিলাম ঠিক রাজযোটক আমাদের হ'ল না, দুটো জীবনকে মিল খাওয়াতে অনেক সংঘর্ষ, অনেক বিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

বাসর-ঘরে সামান্য পরিচয় হ'ল। সারা দিনের পর শরীর ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসছিল। তবু ছিল অদম্য কৌতূহল, প্রাণপণ চেষ্টায় জেগে ছিলাম। হঠাৎ আমার হাতে কার যেন করস্পর্শ অনুভব করলাম। পাশে শায়িত ব্যক্তিটির ওপর একে তো বিরাগের অবধি ছিল না, তাতে তাঁর এই অনধিকার-চর্চ্চায় জ্বলে উঠলাম।

উনি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী।

ন্যাকামিটা আরো যেন অসহ্য ঠেকল। বললুম, জানেন না না কি!

এরকম জবাব হয়ত প্রত্যাশা করেননি। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একটু হাসলেন। বললেন, জানি। তবু জিজ্ঞাসা করতে হয়। আর কী ভাবেই বা আলাপ শুরু করতে পারতাম?

বললাম, আমার নাম উর্মিলা।

ওঃ! উনি বললেন। একটু থেমে ফের বললেন, ও-ভাবে নাম বলতে নেই, নামের আগে একটা শ্রী পরে একটা দেবী বলাই নিয়ম।

নিয়ম নিয়ম। লোকটার এই গায়ে-পড়া গুরুমশাইগিরিতে চটে গেলুম। এই লোকটা নিয়মের বাইরে কিছু জানে না, না কি।

প্রাত্যহিক বিবরণ আর দেবো না, এটুকু উল্লেখ করলেই বোধ করি যথেষ্ট হবে যে স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে যে সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, পরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

দু'-একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমার শ্বশুরবাড়ীতে কোন বিলিতি খানার রেওয়াজ ছিল না। আমার আবার ভোরে বিছানায় শুয়ে চা খাবার অভ্যাস। ক'দিন অপেক্ষা করলুম। শেষে নিজে একদিন ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে কিছু ভালো চা, চিনি আর জমানো দুধ নিয়ে এলুম।

স্বামী খুব ভোরে উঠে ব্যায়াম করতেন। তার পর পাশে পড়বার ঘরে গিয়ে বই, কাগজ ইত্যাদি পড়তেন।

ইচ্ছে ছিল, ওঁকে অবাক্ করে দেবো। উনি উঠে যেতেই সে দিন নিজে উঠে ভালো করে দু'পেয়ালা চা করলুম। সেই সঙ্গে বাপের বাড়ী থেকে আনা বিলিতি বিস্কুটের টিন থেকে খান-কয়েক বিস্কুট বেরুল। পা টিপে টিপে ওঁর পড়বার ঘরের দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছি। উনি পড়ায় অন্যমনস্ক ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, ওঃ, বোসো। তারপর আমার হাতে চা আর বিস্কুটগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওগুলো কী।

বললাম, চা। আমি নিজে করে এনেছি। আমরা দুজনে এখানে বসে খাবো।

উনি এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তার পর ঠাণ্ডা নিরুত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি তো জানো আমি সকালে মাত্র আদা-ছোলা আর গরম দুধ খাই। চা আমি কখনোই খাইনে।

গভীর লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে আমার হাতে চায়ের পেয়ালা দু'টো থরথর করে কাঁপছিল।

একটু পরে উনি আবার বললেন, তবে তুমি খেতে পারো। তোমার রুচির ওপর জুলুম করব, বিয়ের মন্ত্রে এমন কোন কথা ছিল না।

সেই অপমানের পর তিন দিন ওঁর সঙ্গে কোন কথা বলিনি। স্বহস্তরচিত চায়ের পেয়ালা অসীম ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলুম।

কিন্তু অপমানের তখনো কিছু বাকি ছিল। কিছু দিন লক্ষ্য করেছিলুম, ওর কোন রুমাল নেই। অভ্যাসানুযায়ী নিজে দোকানে

গিয়ে ভালো বিলিতি সিল্ক কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। দিন-কতক গোপনে পরিশ্রম করে তাতে এমব্রয়ডারি করা গোটাকতক ফুলও এঁকে দিয়েছিলুম।

আগেই বলে রাখি, এ উপহারও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। উনি কোন বিলিতি জিনিষ ব্যবহার করেন না, সেটা আমার আদৌ খেয়াল ছিল না। সিল্কের রুমালগুলো দিতেই কিছু বললেন না। কেবল আলমারি খুলে এক ডজন খদ্দরের রুমাল বার করলেন। ওঁর এক পিসতুতো বোনকে দিয়ে তৈরি করে নিয়েছিলেন।

প্রচণ্ড ক্ষোভে সমস্ত অন্তরটা বিষিয়ে উঠেছিল। অস্থির একটা জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে কখনো ওঁকে জয় করতে বিবিধ পাশ্চাত্য ছলা-কলার আশ্রয় নিতে গিয়েছি। কিন্তু প্রাচ্যদেশীয় এই মানুষটির নিষ্ঠার বর্মে প্রতিহত হয়ে আমার তূণীরের সব ক'টি শর ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

বুঝে নিয়েছিলেম সমান্তর দু'টি রেলপথে বিপরীতগামী দু'টি গাড়ীর মতো আমরা এক জায়গায় এসে মিলেছি মাত্র। পথ আমাদের এক নয়।

ইতিমধ্যে বাবা মারা গিয়েছিলেন। দাদা একদিন এলেন। চিরকাল আদুরে ছেলে হলে কী হয়, দাদার দৃষ্টি খুব প্রখর ছিল। দু'মিনিট আমার সঙ্গে, দু'মিনিট আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলে, একবার দু'জনের বিভিন্ন পদ্ধতির বেশভূষার দিকে চোখ বুলিয়ে সমস্ত অবস্থাটা বুঝে নিলেন।

আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তুই আমার সঙ্গে চল।

মনের অবস্থা তখন কী ছিল বলতে পারিনে, বললাম, তাই চলো দাদা।

দাদা বললেন, যাই ওকে একবার বলে আসি। আমি বললাম, দাঁড়াও দাদা। যা বলবার আমিই বলব।

উনি চুপ করে ঘরের মধ্যে বসেছিলেন। গিয়ে আমি বললাম, আমি চলে যাচ্ছি।

উনি বুঝলেন কি না জানি না, কথাটা শুনে চমকে উঠলেন। বললেন, চলে যাচ্ছো, সে কি, কোথায় ?

কঠোর একটা জবাব দেবো ইচ্ছে করেছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে কেমন একটা মায়া হল। খানিক পরে উনিই শান্ত কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা যাও। আমার শিক্ষা এবং রুচি দিয়ে তোমাকে জয় করতে পারিনি, সে আমি জানতাম।

বাপের বাড়ী এলাম। সেই পুরনো আসবাব, চেনা আবহাওয়া, মাছ যেন আবার জলে পড়ল। দিনকতক খুব মনের সুখে বেড়িয়ে, সিনেমা দেখে, পিকনিক করে কাটলো। অতিরিক্ত উত্তেজনার পর অবসাদ আসতেই এক দিন আবিষ্কার করলুম, এ বাড়ীর আবহাওয়ায় কোথায় যেন পরিবর্তন ঘটেছে। বাবা অবশ্য নেই, কিন্তু এইটেই একমাত্র কারণ নয়। সকলের অগোচরে কোথায় যেন দুনিরীক্ষ্য পরিবর্তনের ধূলো জমছিল।

ক্রমশঃই বুঝতে পারছিলুম, যত হৈ-চৈ করি না কেন, পুরনো কুমারী-জীবনে আমি আর কোন দিন ফিরে যেতে পারবো না। ছোট বোন আর দাদার মেয়েরা মিলে এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্যের রূপ দেবে ঠিক করেছিল, কিন্তু সেখানে আমার ডাক পড়েনি। না পরিকল্পনায়, না আয়োজনে, না মহলায়। জানতে পারলাম, ওদের আয়োজন যখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ছোট বোনকে ডেকে বললাম, আমাকে কেন বললি না, আমিও তোদের সাহায্য করতে পারতাম।

ছোট বোন অনায়াসে বললে, বাঃ রে, এ তো ছোটরা অর্থাৎ কুমারীরা মিলে করছি। তুমি এর মধ্যে কেন আসবে দিদি।

আঘাত পেলাম। আমার বিবাহিত জীবনকে আমি অস্বীকার করলে কী হয়, এরা ভুলতে পারে না। সীমন্তের সিঁদুরের রেখা আমার অতীত আর বর্তমানের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরাল রচনা করে রেখেছে।

বাড়ীতে আরো অনেক ছেলেরা আসত। বোনেদের, ভাইঝিদের তারা বেড়াতে নিয়ে যেতো, গান শুনতো, শপিংয়ে সাহায্য করত, ড্রয়িং-রুমে বসে হাসি গল্প খোসামোদের ফোয়ারা খুলে দিত। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, আমাকে দেখলেই সবাই কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। আমাকে লক্ষ্যই করে না, আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে গেলে উঠে দাঁড়ায়, সম্ভ্রমের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে, তারপর ছট্‌ফট্‌ করে সরে যাবার জন্যে, পাশের ঘরে যেখানে ছোট বোন পিয়ানোয় সঙ্গীতের আতিথ্য খুলে দিয়েছে।

শুধু ছোটরাই নয়। বৌদি সারা দিন সংসারের তদারক করতেন। কিন্তু আমাকে কিছু ছুঁতে দিতেন না। বলতেন কাজ নেই ভাই তোমার কাজ করে। দু'দিনের জন্যে এসেছ হেসে-খেলে জুড়িয়ে যাও।

ইচ্ছে হত চীৎকার করে বৌদিকে বলি, দু'দিনের জন্যে আসিনি। আমি অতীতকে মুছে দিয়ে বর্তমানের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক রচনা করতে চাই। তোমরা ভুলে যাও যে আমি বিবাহিত।

বাপের বাড়ীর এই অলক্ষ্য অথচ অনুভবনীয় অবহেলা আমাকে আরেক জনের দিকে ধীরে ধীরে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি ঠাকুমা। তিনি তখনো জীবিত ছিলেন, কিন্তু অস্তিত্ব আমরা প্রায় ভুলেই ছিলাম।

অনেক দিন অন্য সব ঘাট থেকে ধাক্কা খেয়ে এসে দেখেছি ঠাকুমা পূজোর থালায় নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন। ধূপে ধূনোয় সুরভিত, মৃদু ঘৃতদীপে স্বল্পালোকিত সেই কক্ষের সামনে এসে ভেতরে ঢুকতে আর পা সরত না। কেমন একটা রহস্যময় রাজ্যের সীমান্তে এসে চেতনা যেন অবসন্ন হয়ে পড়ত।

ঠাকুমা এসে আমাকে ডেকে নিতেন। বলতেন, চান করে এসেছিস তো। কাপড় ছেড়েছিস?

ঠাকুমার কাছেই আমার নতুন জীবনের দীক্ষা হল। ঠাকুর-দেবতায় কখনোই ভালো করে বিশ্বাস করিনি, এখনো করি না। কিন্তু মৃন্ময় মূর্তির অর্চনার মধ্য দিয়ে আমার ব্যর্থ জীবনের গ্লানি যে অন্ততঃ রোজ

কয়েক ঘণ্টার জন্যেও ভুলে থাকতে পারতাম, সে-কথা আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

তাছাড়া ঠাকুমার কাছে বই ছিল। সে-সব বইয়ের নাম ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি, চোখে দেখা দূরে থাক। মাঝে-মাঝে খেয়ালের বশে সে-সব বইয়ের পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলাম। শেষে সে-সব বই রীতিমত পড়তেও শুরু করলাম। দুরূহ শাস্ত্রের যে সব জায়গা দুর্বোধ্য মনে হত, ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি বুঝিয়ে দিতেন।

ঠাকুমা কৌশলে আমাকে কয়েক বার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি সুকৌশলে সোজাসুজি উত্তর এড়িয়ে গিয়েছি। শেষে একদিন চেপে ধরাতে সব খুলে বলতে হল। আমার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার সমস্ত ইতিহাস ঠাকুমাকে বললাম। বললাম, রুচিবিরোধের কাহিনী, ওঁর প্রাচীন-পন্থী নিষ্ঠা, স্বাদেশিক বেশভূষা, আমাকে নিঃশব্দ অবহেলা।

শুনে ঠাকুমা বললেন, ভুল করেছিস। খাঁটী জিনিষ ছেড়ে তুই মিথ্যের পেছনে ছুটেছিস।

আমিও তাই ভাবছিলাম। তবু একবার অভিমানভরে বললাম, কিন্তু তিনিও তো আমার খোঁজ করেননি ঠাকুমা।

ঠাকুমা বললেন, সেটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার একটা স্বতন্ত্র শিক্ষা, রুচির বৈশিষ্ট্য, উঁচু আদর্শ আছে। তুই তো তার আদর্শের চেয়ে বড়ো নোস্।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

দাদাকে বললাম, আমি ফিরে যাবো। দাদা বিস্মিত হলেন, কিন্তু আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন, বাধা দিলেন না।

মনে আছে, সেদিন শাদা খদ্দরের লাল-পেড়ে শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি ; কপালে বড়ো করে সিঁদুরের ফোঁটা এঁকে ভেবেছি, এত দিনে বিলিতির খোলস খসে আমার জন্মান্তর ঘটলো। উদ্দেশে

স্বামীকে নমস্কার জানিয়ে মনে মনে বলেছি, এত দিনে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করলুম।

সেটা আগষ্ট-আন্দোলনের সময়। মহাত্মা গান্ধী ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়ায় দেশ অসহিষ্ণু, চঞ্চল। আমি জানতুম, আমার স্বামী কংগ্রেসসেবী, আমি জানতুম, এ আন্দোলনে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না, তাঁকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। স্থির করেছিলুম, আমিও দূরে থাকবো না। স্বদেশসেবায় স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

বিকেল বেলা শ্বশুর-বাড়ী ফিরলুম। উনি কাজে বেরিয়েছেন, তখনো ফেরেননি। চুপ করে তাঁর ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলুম।

ঘরখানা দেখে এবারে অবাক্ লাগলো, পুরনো আসবাব কিছু নেই। হালকা, শস্তা হালফ্যাসানের খানকয়েক চেয়ার-টেবিলে ঘরটা বিলিতি-রীতিতে সাজানো। দেয়ালের ছবি থেকে টেবিলের সস্তা ইংরিজি পত্রিকাগুলোয় একটা বিজাতীয় রুচি।

একটু পরে জুতোর মস্‌মস্ শব্দ করে নিখুঁৎ টাই-কলার-ট্রাউজার পরা ভদ্রলোক শিষ দিতে দিতে ঘরে ঢুকলেন, তিনি কে? বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি, তিনিই আমার স্বামী।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন, তার পর বললেন, তুমি? একদম চেনাই যাচ্ছিল না যে। ভারি বদলে গেছ।

জামা-কাপড় ছেড়ে একটা সিগ্‌রেট ধরিয়ে প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করে বললেন,—তার পর, খবর কী? চলে যাবে, না থাকতে এসেছ।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম,—আমার ভয় ছিল, তোমাকে দেখতে পাবো না। হয়ত বা জেলে গেছ। কংগ্রেস আন্দোলনে—

সিগ্‌রেটে পরিপূর্ণ একটা টান দিয়ে স্বামী বললেন, টু হেল উইথ কংগ্রেস। ও-সব অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছি। একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন,—তুমি বোধ হয় একটু অবাক্ হচ্ছ। স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু দেখো, সময়ের সঙ্গে চলতে হয়। পুরোনো বামুনে চাল-চলনে দেখলাম, নিজের স্ত্রীকেই খুসি রাখা যায় না, অন্যে পরে কা

কথা। তুমি যে-দিন ছেড়ে গেলে, সে-দিনই কথাটা মর্মে মর্মে বুঝেছি। নিজের ওপর ধিক্কার এসেছে। সেই থেকে প্রাণপণ সাধনায় নিজেকে নতুন করে গড়তে চেষ্টা করেছি, যাতে তোমাদের জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি। কত দূর কৃতকার্য হয়েছি, সেটা তুমি বিচার করো।

বলতে বলতে স্বামী হাঁটু ভেঙে বসবার ভঙ্গিতে আমার সমুখে আনত হয়ে একখানি হাত স্পর্শ করলেন।

আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলাম। খদ্দরের শাড়িটা সর্বাঙ্গে যেন একটা পরিহাসের মত জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

এই দ্বিতীয় বার আমি আর আমার স্বামী দু'খানি রেলগাড়ীর মত একই জায়গায় এসে পৌঁচেছি। এবারেও কিন্তু বিপরীতমুখী, সমান্তর পথে।

ছাপ

টেলিফোনের রিসিভারটা সশব্দে রেখে দিয়ে ডাক্তার বললেন, আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

বিস্মিত হয়ে সবাই বললাম, সে কি!

বিস্মিত হবারই কথা। যুদ্ধশেষে ছোটনাগপুরের ছোট এই শহরটিতে জীবনযাত্রার কোন বৈচিত্র্য ছিল না। সৈন্যরা একে একে ছাউনি তুলছে। কনট্রাক্ট বন্ধ। কাজের মধ্যে সন্ধ্যার পর ক্লাবে এসে জোটা, সিগরেটের ধোঁয়ায় কুণ্ডলী পাকানো। নতুন নতুন ফরমূলার ককটেল তৈরী, উঁচু ষ্টেকে ব্রিজ খেলা।

ডাক্তার ছিলেন আমার পার্টনার। বললাম, অন্ততঃ 'রাবার'টা ক্লোজ করি, আসুন।

—মাথা খারাপ হয়েছে আপনার। এখুনি যেতে হবে। মার্ডার কেস।

—মার্ডার! শীতের দিনে ক্লাবের নিরাপদ আরামে বসে থেকেও উত্তেজনা বোধ করলাম। কোথায়?

ককটেলের অবশেষটুকু নিঃশেষ করতে করতে ডাক্তার যে পাড়ার নাম করলেন, সেটা শহরের উপকণ্ঠে কুখ্যাত ফিরিঙ্গি মহল।

ব্যাগটা গুছিয়ে নিতে নিতে ডাক্তার বললেন, চলুন না আপনিও। বেশ ইন্টারেষ্টিং হবে।

আপত্তি ছিল না; ক্লাবে বসে কুঁড়েমির চেয়ে এ এ্যাডভেঞ্চার অনেক ভাল। বললুম, চলুন।

নির্দিষ্ট বাড়ী খুঁজতে বিশেষ অসুবিধে হ'ল না। ইতিমধ্যেই বাইরে ছোটখাটো ভীড় জমে গিয়েছিল। পুলিশও এসেছে দেখলাম।

ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র তচনচ। ঘরের কোনে ভাঙাভাঙা একটা বাক্স। আর মাঝখানে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে রক্তস্রোতের মধ্যে শায়িত।

ছিন্ন নৈশবাস আততায়ীর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সাক্ষী। প্রায় নগ্ন দেহের নানা স্থানে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন।

ডাক্তারের করবার কিছুই ছিল না। ইতিপূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। তবু প্রাথমিক খানিকটা পরীক্ষা করতে হ'ল। দু'মিনিট নাড়াচাড়া করে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। পুলিশ ইন্সপেক্টরকে একান্তে ডেকে নিয়ে কি একটু আলাপ করলেন; বোধ হয় মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে। সমস্ত ঘরে বিশৃঙ্খল অবস্থা, বোঝা যায়, অর্থলোভই এই হত্যাকাণ্ডের মূলে।

ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে এসে যখন গাড়িতে উঠে বসলাম তখন প্রায় বারোটা। শীতের রাত্রি; ঝাউগাছের মাথায় কুয়াশা নেমে এসেছে। ফিরিঙ্গি পাড়ায় কলরব তখনো থামেনি। এখনো বাতায়নপথে তীব্র আলোকচ্ছটার সঙ্গে প্রমত্ত সুরলহরী ভেসে আসছে; দুমদাম দুপদাপ শব্দ, যৌথ নৃত্যের ইঙ্গিত। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে-যাওয়া কুকুরের বিরক্ত চীৎকার।

ডাক্তার একমনে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। একাগ্র দৃষ্টি সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ। পীচের পথে অস্পষ্ট আলো। ডাক্তারকে একটু অন্যমনস্ক মনে হ'ল।

ভেবেছিলাম, আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে ডাক্তার চলে যাবেন। কিন্তু ক্লাবের রাস্তায় ফের গাড়ি ঘুরতেই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আবার ক্লাবে?

—ক্ষতি কী? ডাক্তার বললেন, চলুন না। কাজ তো নেই। আমার মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে।

একটু অবাক লাগল। ডাক্তার মানুষ, এ রকম ঘটনা তো কতই দেখছেন। ওদের মনও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায়, আমার এই রকম ধারণা ছিল। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডেও বিস্ময়কর কিছু নেই। এই ধরণের স্ত্রীলোকদের জীবনের এমনতরো বীভৎস উপসংহারের অসংখ্য ঘটনা জানি।

ক্লাবে বসে ডাক্তার নিপুণহাতে আবার কয়েকটি উত্তেজক পানীয়ের উপাদেয় সংমিশ্রণ ঘটালেন। তারপর সিগারেটের কুণ্ডলীগুলোকে খোলা জানালা দিয়ে একটার পর একটা পাঠাতে লাগলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলি হাওয়ায় বিপর্যস্ত হ'ল, সেদিকে নিমেষহীন চেয়ে রইলেন। হাতের সিগারেটটার যদিও আধখানা বাকি ছিল, সেটা ফেলে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবেই আরেকটা ধরালেন। তারপর নিরাসক্তভাবে পানপাত্রে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, মার্থা জনষ্টোনকে আমি চিনতাম।

কী করে চিনলেন, সে প্রশ্ন আর করলাম না। চিকিৎসাসূত্রে ডাক্তারদের এমন অসংখ্য মানুষকে চেনবার সুযোগ হয়।

—মার্থা জন্‌ষ্টোন কে?

—আজ যে মেয়েটি খুন হ'ল।

ডাক্তার বললেন, আজ নয়, এখানেও নয়। আমি ওকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। ওর বয়স তখন পোনেরো ষোল হবে, আমার তেরচৌদ্দ।

এইটুকু বলে ডাক্তার আবার পানপাত্র তুলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

—ভয় নেই। শীতের রাত্রে আপনাকে একলা পেয়ে পুরনো একটা প্রেমের গল্প নিজের ব'লে চালিয়ে দেবো, আমি সে রকম লোক নই।

অস্বীকার করে লাভ নেই, আমার অস্বস্তি লাগছিল। সমস্ত ক্লাবটাতে আমরা দু'জন ছাড়া কেউ নেই। দরজার পাশে ক্লাবের চাকর লছমন ঝিমুচ্ছে; আমরা উঠলেই আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুতে যাবে।

ডাক্তার বললেন, আমি ছোটবেলা যেখানে মানুষ, তার পাশেই একটা মিশনারি কম্পাউণ্ড ছিল। আপনাদের একথা অনেকবার অনেক প্রসঙ্গে বলেছি। এখনো মনে আছে, রবিবার হ'লেই আমাদের দল বেঁধে সাণ্ডে স্কুলে যাওয়া। খৃষ্ট মাহাত্ম্য শুনতে ততটা নয়, স্কুলের শেষে লজেন্স বিস্কুট প্রসাদ বিতরণের মাহাত্ম্যে যতটা। মেম সাহেব নিজ হাতে সেগুলো বিতরণ করতেন।

একবার এক নতুন পাদ্রী সেখানে বদলি হয়ে এলেন। নাম উইলিয়ম জনষ্টোন। এক ছেলে দুই মেয়ে—পীটর, মেরি, মার্থা। আজ এই শহরের বিশ্রী একটা পাড়ায় যে গণিকার জীবনের যবনিকা পড়ল, সে যে এক ধর্ম্মভীরু খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের মেয়ে একথা শুনে চমকে যাবেন না। মার্থা যখন এল, তখন ও সবে ফুটছে। নারীর রূপে আকৃষ্ট হবার বয়স সেটা আমার নয়। তবু অবচেতন আকর্ষণ যে একটা অনুভব করতাম, সেটা অস্বীকার করে লাভ নেই। মনে আছে, সাণ্ডে ইস্কুলের পর যখন প্রার্থনা হ'ত, তখন মাঝে মাঝে সবার অলক্ষিতে চোখ মেলে মার্থার দিকে চুরি করে চেয়েছি। নীল একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা ওর ঢেউতোলা সোনালী চুল, রেশমি ফ্রকের নীচে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আভাস, এমন কি জানু অবধি নাতিস্থূল, নাতিকৃশ পা দুটির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আমার সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেছে।

—তখন আপনার বয়স তো মোটে তের-চৌদ্দ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হ্যাঁ। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার বললেন, বয়সের তুলনায় আমি কিছু বেশিই পাকা ছিলাম।

বাইরে তখন দস্তুর মত হিম পড়ছিল। ডাক্তার উঠে গিয়ে কবাট-গুলো টেনে দিয়ে এলেন। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন—হ্যাঁ, মিছিমিছি ভূমিকা বাড়াব না। ডাক্তারের মুখে কবিত্ব মানায়ও না। আমি মার্থার প্রেমে পড়লাম। কিন্তু মুসকিল হ'ল এই, একে বয়স অত্যন্ত অল্প, তাতে আবার ইংরেজী ভাষাটা মুখে ততটা সহজে জোগাত না। মার্থার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে এসেছি, এমন ব্যাপার অনেকবারই ঘটেছে।

হয়তো মুখের ভাষা লাগত না, চোখের ভাষাতে এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ হয়। কিন্তু মার্থা আরেক জনের প্রেমে পড়ে গেল।

সেবার গরমের ছুটিতে আমার পিসতুতো ভাই কলকাতা থেকে ওখানে বেড়াতে গেলেন। তিনি তখন কলেজে কোন্ ইয়ারে পড়তেন

ঠিক মনে নেই। কেন না, একই ইয়ারে কয়েক বছর ধরে ন-যযৌ ন-তস্থৌ হয়ে থাকার অভ্যাস তাঁর ছিল। তা হ'লেও ভদ্রলোকের কতকগুলো গুণ ছিল; তিনি ভালো গান গাইতে এবং বাঁশী বাজাতে পারতেন; দেখতে সুপুরুষ ছিলেন; ইংরিজী ভাষাটার কথারূপ সম্পর্কে তাঁর বিলক্ষণ ধারণা ছিল। এক কথায় তিনি স্মার্ট তো ছিলেনই, উপরন্তু মেয়েরা যা চায়, তাও ছিলেন।

একদিন আমাদের সঙ্গে পাদ্রী সাহেবের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে মার্থাকে দেখে এলেন। দ্বিতীয় দিন একাই গেলেন। আগেই বলেছি, জনপ্রিয় হবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। তৃতীয় দিন বাসায় এসে বললেন, সদলে পিক্‌নিক্ করবার একটা আয়োজন তিনি করে এসেছেন।

মাঝখানে রবিবার ছিল। তিনি প্রার্থনা সভাতেও গেলেন। প্রার্থনা চলেছে, আমিও যথারীতি চোখ মেলে মার্থার দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি; একবার দেখি মার্থা ঠিক আমার পাশে উপবিষ্ট শ্যামলদার দিকে তাকিয়ে আছে। আর শ্যামলদাও যে ঠিক তন্ময় হয়ে প্রার্থনা করছেন না, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আমার হয়েছে। কেমন বিশ্রী লাগল। একে 'জেলসি' বলতে চান, বলুন।

পিকনিকের দিন শ্যামলদা বাঁশী বাজালেন। হয়ত খুব চমৎকারই হয়েছিল। কিন্তু আমি তো বাঁশী শুনছিলুম না। আমি দেখছিলুম, মার্থা তখন থেকে অপলক চোখে শ্যামলদার দিকে চেয়ে রয়েছে। ওর চোখে মুগ্ধ সর্পিনীর দৃষ্টি।

এর পরের ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেল। শ্যামলদা আর মার্থাকে প্রায়ই এক সঙ্গে দেখা যেতে লাগল। দু'একজনের কাছে ধরাও পড়ে গেল ওরা। কানাকানি হতে লাগল—পাদ্রী সাহেবের মেয়ে অমুক একটা বাঙালী ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে।

পাদ্রী সাহেব প্রথমটা খেয়াল করেন নি; খেয়াল হ'তে শ্যামলদাকে ডেকে পাঠালেন। ডেকে রুদ্ধকক্ষে তিনি যে হিতউপদেশমূলক বক্তৃতা

দিলেন, তার সারমর্ম এই : 'যুবক, আমার কোন বর্ণ-বিচার নেই। কেবল তুমি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হও। কেননা, যীশুকে যে ত্রাণকর্তা বলে মেনেছে, একমাত্র তার হাতেই আমার কন্যা মার্থাকে সম্প্রদান করতে পারি।'

শ্যামলদা জনষ্টোনকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন জানি না। পরদিন সকালে উঠে তাঁকে আর আমাদের বাসায় দেখা গেল না।

মার্থাকেও না। এর অর্থ সুস্পষ্ট। পুলিশে খবর দিলে হয়ত একটা কিনারা হত ; কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয় সাহেবদেরও থাকে। পাদ্রী সাহেব এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইলেন না। হয়ত নিয়ত নিয়মিত তিনি ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের ছবির দিকে চেয়ে প্রার্থনা করেছেন, তাঁর বিপথ-গামিনী মেয়ে যদি কখনও ফিরে আসে, যীশু যেন তাঁর পাপের ভার গ্রহণ করেন।

কিন্তু মার্থা আর ফিরে আসেনি। কিছুদিন বাদে জনষ্টোন সাহেবও বদলি হয়ে চলে গেলেন। আস্তে আস্তে এ ঘটনার স্মৃতিও আমার মনে ক্ষীণ হতে হতে প্রায় মুছে গেল।

প্রায় তিন বছর পরে—আমি তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছি—খড়গপুর ষ্টেশনে মার্থাকে দেখলাম। মার্থাই তো। প্রথমটা সংশয় ছিল, বিস্ময় ছিল, অকস্মাৎ প্রিয়জনকে দেখার আনন্দ ছিল। মার্থা ছাড়া আর কার অমন সোনালী চুল, নীল চোখে সুদূর, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কবিতার যতির মত নিয়মিত চরণপাত ?

আমাকে দেখে মার্থা লজ্জিত হ'ল কিনা জানি না, মুখে খুব আদর দেখাল। নিভৃতে আলাপ করবার জন্য চায়ের দোকানে গিয়ে বসলুম। হ্যাঁ, মার্থা শ্যামলের সঙ্গেই আছে। এখানকার রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করে শ্যামল। সুখী হয়েছে কিনা, সে কথা মার্থাকে আর জিজ্ঞাসা করলুম না। ওর উচ্ছ্বসিত হাসি, প্রাণময় কথা থেকেই বোঝা গেল।

ঠিকানা মার্থার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম। খুঁজে খুঁজে ওদের

কোয়ার্টারে যখন হাজির হ'লাম তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। মার্থাই দরজা খুলে দিল। শুনলাম, শ্যামলদা তখনো ওয়ার্কশপ থেকে ফেরেনি। অথচ পাঁচটায় সিফ্‌ট্‌ ছুটী। বোধ হয় ওভারটাইম খাটছে, মার্থা বলল।

চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করতে করতে মার্থা বলল, তোমার দাদার জন্যেও জল নিই, কি বলো। উনি এর ভেতর ঠিক পৌঁছে যাবেন।

চা ঢালছে আর উৎসুক কানে রাস্তার প্রতিটি পদশব্দ শুনছে, মার্থার সেই চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। শ্যামলদা কিন্তু এল না। আমাদের দু'জনকে তিন পেয়ালা করে চা খেতে হ'ল।

জানালার পাশে বসে মার্থা উলের কি একটা কাজ নিয়ে বসল; আমিও কাছাকাছি বসে গল্প চালাতে লাগলুম। না, ছেলেপুলে ওদের হয়নি, মার্থা আরক্ত হয়ে বললে,—তোমার শ্যামলদা ওসব ভালো-বাসেন না।

মিনিটের পর মিনিট বসে মার্থার কাছে ওর যৌথ জীবনযাত্রার বিবরণ শুনলুম। মার্থা কখনো উচ্ছ্বসিত, কখনো ব্রীড়াময়ী, কখনো কুণ্ঠিত। পলকে পলকে মুখের রঙ বদ্‌লাচ্চে, মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলুম। এ নারীর সেই কল্যাণময়ী রূপ যা নিমেষহীন চোখে অনন্তকাল ধরে দেখেও বলা যায়, নয়ন না তিরপিত ভেল।

মোটের ওপর বাপ মার আশ্রয় ছেড়ে যে মোহে মার্থা একদিন অনিশ্চিত পথে পা বাড়িয়েছিল, আজ অবধি তা এতটুকু ম্লান হয়নি। নতুন নীড়টুকু ঘিরে ওর অনেক স্বপ্ন, অনেক কামনা, অনেক ভরসা।

বহুক্ষণ কেটে যেতেও শ্যামলদা যখন এলেন না, মার্থা চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতের উলের কাজটাকে ফেলে একবার বলল, চলো তোমাকে খেতে দিই; একবার বলল, আরেকটু না-হয় বোসো, বেশ তো গল্প করছি। তোমার দাদা এখুনি আসবেন।

দাদা 'এখুনি' কেন, কখনোই এলেন না। আমাদের খাওয়া শেষ হল, আরেক প্রস্থ গল্প শুরু এবং শেষ হ'ল; রাস্তার শেষ পদশব্দটিও

যখন মিলিয়ে গেল, নির্দিষ্ট বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখনো দেখলুম, মার্থা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পথের নিষ্প্রভ আলোগুলির দিকে তাকিয়ে আছে।

শেষ রাতে মার্থার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে তাকাতেই বলল, তোমার দাদা এসেছেন।

—কোথায়?

মার্থা কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করে দরজার বাহিরে এসে দেখি, শরীরের অর্ধেক নর্দমায় কর্দমাক্ত, অর্ধেক চৌকাঠের ওপর, কে একজন বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে।

মার্থা ফিস ফিস করে বলল, তোমার দাদা। আমি একলা তুলে আনতে পারিনি। তাই তোমাকে ডেকেছি।

দু' জনে ধরাধরি করে শ্যামলদাকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মার্থা কাদামাখা পোষাক বদলে, মাথা ধুইয়ে বাতাস করতে লাগল। শ্যামলদা তখন বিজড়িত স্বরে প্রলাপ বকছেন।

পরদিন কলকাতায় চলে এলাম। শুনলাম, শ্যামলদার এমন প্রায়ই হয়। মার্থা মাঝে মাঝে খবর নিতে বলল। 'ওঁর জন্য মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। আমার জন্য কী-না করেছেন। আত্মীয়-স্বজন সব ফেলে এসে এই এখানে কারখানায় চাকরি—"

শ্যামলদার জন্য মার্থাও যে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ফেলে এসেছে ওর সামনে, সেই কথাটার উল্লেখ করলাম না।

কলকাতায় এসে মাঝে মাঝে মার্থার চিঠি পেতাম। "ওঁকে বড় বিষণ্ণ মনে হয়; এক এক সময় উদাস হয়ে কী যেন ভাবেন।"

কিম্বা, "আমি বোধ হয় ওকে সুখী করতে পারিনি। আমি যদি বাঙালী ঘরের শান্ত শ্যামল কোন মেয়ে হতুম!"

শেষে একখানা চিঠি পেলাম শ্যামলদা কী একটা ট্রেনিং স্কীমে শিক্ষানবিশ হয়ে বিলেত গেছেন। ফিরতে বছর খানেক লাগবে।

মার্থা আনন্দেই সম্মতি দিয়েছিল; "আমি তাঁর পথে বাধা হতে চাই

না। আমি জানি তিনি ফিরে আসবেনই। আমি তাঁর প্রতীক্ষায় থাকব।"

আরেক পাত্র পানীয় ঢেলে নিয়ে ডাক্তার তাঁর দ্বিতীয় প্যাকেটের চতুর্থ সিগারেট ধরিয়ে ইসারায় আমাকেও আমন্ত্রণ করলেন। আমি বললাম, খাবনা। তারপর কী হ'ল বলুন।

ডাক্তার সুরু করলেন,—কিন্তু প্রতীক্ষায় থাকা যে কত শক্ত সেটা মার্থা দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহেই অনুভব করল, যখন সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে ওকে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'ল। পুঁজিও বড় বেশী ছিল না। স্থানীয় খৃষ্টানেরা কানাঘুষায় ওর ইতিহাস কতকটা জানত। তারা ওকে স্থান দিলে না।

কলকাতায় এসে মার্থা একটা ছোট বাসা করল। আমিও কলেজ, হোষ্টেলের খরচ বাঁচিয়ে ওকে সাধ্যমত সাহায্য করতুম। কিন্তু ভদ্রভাবে বাঁচতে হলে একটি মেয়ের যা লাগে তার তুলনায় সে আর কতটুকু? চাকরির চেষ্টা করেও সুবিধে হ'লনা। শেষে যখন তিন মাসের ঘরভাড়া বাকি, চারধারে দেনা, তখন একদিন মার্থার ঘরের সুমুখে গিয়ে দেখি, তালা ঝুলছে।

শেষ চুমুক খেয়ে ডাক্তার রুমালে মুখ মুছলেন,—না আত্মহত্যা সে করেনি। করলে একটা উৎকৃষ্ট মরালযুক্ত কাহিনী হত, কিন্তু আজকের ঘটনা ঘটত না; এ অবস্থায় অভিভাবকহীন মেয়েদের জীবনে নানারকম প্রলোভন এসে থাকে। মার্থারও এসেছিল। প্রথমটা ভ্রূক্ষেপ করে নি। কিন্তু শেষে প্রলোভনই জয়ী হ'ল। মার্থা দেহের চেয়ে প্রাণকে বেশী মূল্য দিলে। অর্থাৎ দেহ দান করলে।

এ-রকম ঘটনায় বিস্ময়ের কিছু নেই। মার্থাকে আমি ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম। তবু ওর এই আচরণ আমি স্বাভাবিক বলেই মেনে নিলুম। কিন্তু যেটা সেদিন বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল, সেটা আজ আপনাকে বলি। অসংখ্য ফিরিঙ্গি অনুরাগী থাকতেও মার্থা যার সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধল, সে ওর বাসায়ই বাড়িওয়ালা, এবং সে বাঙালি।

বইয়ে ঝাউগাছে শোঁ-শোঁ হাওয়া বইছে, শুনছিলুম। ক্লাবের বেয়ারাটা ক্লান্ত হয়ে কখন দরজার পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাক্তারবাবু থেমে যেতেই সমস্ত ক্লাবঘরটিতে দেয়াল ঘড়িটার টিক্ টিক্ ছাড়া কোন শব্দ নেই।

—আপনার শ্যামলদা ফিরে এসেছিলেন ? জিজ্ঞাসা করলুম।

ডাক্তার হাতখানা ঘুরিয়ে একটা অনির্বচনীয় ভঙ্গি করলেন: এসেছিলেন হয়ত ; হয়ত আসেন নি। মূল কাহিনীতে শ্যামলদার আর কোন ভূমিকা নেই। আমি যতদূর জানি, মার্থার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি।

প্রায় দু'বছর বাদে, আমি তখন ডাক্তারির নীচের ক্লাসে পড়ছি, একদিন সকালে মেস্ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখি মার্থা। আগের চেয়ে কিছু কৃশ হয়েছে। রূপের সে স্নিগ্ধ দ্যুতি নেই। মুহূর্তে ওর সমস্ত অতীত ইতিহাসটি আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ বলে প্রতীয়মান হল, বেশ একটু রুক্ষ ভাবেই বললাম, কী চাই ?

আমার স্বরের রূঢ়তা ও লক্ষ্য করল ; কিছু বলল না, কিন্তু মাথাটা ঈষৎ আনত হয়ে পড়ল। খানিকটা ইতস্ততঃ করে বলল, তোমার দাদার কোন খবর জানো ?

—না। কিন্তু তোমারই বা এখন সে খোঁজে দরকার কী !

সে কথার জবাব না দিয়ে উৎসুককণ্ঠে মার্থা বলল,—কিন্তু এই সপ্তাহেই ওর ফেরবার কথা ছিল যে।

আঘাত করবার নেশা তখন আমাকে পেয়ে বসেছে। নীরস গলায় বললাম, হিসেব রাখতে ভোলনি দেখছি। কিন্তু তোমার কীর্তিকাহিনী শোনবার পর দাদা আর তোমার দিকে ফিরে চাইবেন ভেবেছ ?

ওর সমস্ত মুখ নিমেষে রক্তহীন, বিবর্ণ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোন কথা বললে না। বুঝলুম মাত্রাটা কিছু বেশি হয়ে গেছে। তাই খানিকটা মমতার সুরে বললাম, খড়্গপুরে খোঁজ নিয়েছিলে ?

মার্থা অস্ফুটস্বরে একবার বললে, 'না', তারপর চলতে শুরু করে দিলে। আমি ওকে ডেকে ফেরাতে পারতুম। কিন্তু তাতে কোন লাভ হত না। শ্যামলদার ঠিকানা সত্যিই আমার জানা ছিল না।

তা'ছাড়া মার্থা 'না' বললেও আমি হলপ করে বলতে পারি, ও প্রথমেই আমার এখানে আসেনি। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই খড়্গাপুর গিয়ে খোঁজ করে এসেছে। সেখানে কোন খবর না পেয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে আমার কাছে এসেছে।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে তিনটে বাজল। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর জড়িয়ে আসছে। আলস্যে হাই তুললুম, ডাক্তার সেটা লক্ষ্য করলেন।

বললাম, রাত ফুরিয়ে এসেছে।

—আমার গল্পও ফুরিয়ে এসেছে, ডাক্তার বললেন, একটা সিগারেট দিন।

সিগারেট ধরিয়ে ফের শুরু হল,—মার্থার কথা হয়ত আমি ভুলেই যেতাম। গিয়েছিলামও। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধ বাধল, আমি পাশ করলুম, এবং সৈন্যদলে চাকরী নিলুম। রাঁচির কাছাকছি কোন একটা জায়গায় আমাদের ছাউনি পড়েছিল, একথা আজকে প্রকাশ করলে ভারত-রক্ষা বিধান অমান্য করা হবেনা।

আমাদের দলে ইংরেজ ছিল, শিখ ছিল, পাঠান ছিল, এমন কি কিছু বাঙালীও ছিল। আমি ছিলুম দলের ডাক্তার।

কাজ বেশী নেই; অনেক দূরে ফ্রন্টে লড়াই হচ্ছে, তার তাপ এতদূর পৌঁছায় না। শিস দিয়ে, ড্রিল করে, তাস খেলে সময় কাটাতে হ'ত। সৈন্যদের অবশ্য আরেকটা বিলাস ছিল, নারী শিকার।

সন্ধ্যা হতেই দলে দলে ভাগ হয়ে ওরা শহরে যেতো। জীপে, ট্রাকে, বাইকে, পদব্রজে। শহরের নিষিদ্ধ পল্লীর প্রান্তে সারে সারে গাড়ী দাঁড় করানো আছে, এ দৃশ্য আপনারাও অনেকবার দেখেছেন।

একদিন একটা ইংরেজ সৈন্য মাতাল হয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ফিরে এল। শুনলুম গণিকা পল্লীতে বিশ্রী একটা ঘটনায় জড়িয়ে

পড়েছিল। আমাকে ওর চিকিৎসা করতে হল। আঘাতটা বেশী গুরুতর হয়নি, একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এল।

ওর মুখেই ঘটনাটা শুনলুম। একটি ফিরিঙ্গি মেয়ের কাছে গিয়েছিল...মেয়েটি রাজী হয়নি। অনেক টাকা, চকোলেট, বিস্কুট,—কিছুতেই না।

ফ্রেডারিক যত সাধে, মেয়েটি তত বলে, না।

কেন ?

শরীর ভাল না।

কুৎসিত একটা শপথ উচ্চারণ করে ফ্রেডারিক বললে, অথচ আমি নিশ্চয়ই জানি, ডাক্তার, ওর শরীর নূতন একটা ইঞ্জিনের মতই মজবুত ছিল।

কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানেও কিছু আসত যেত না, যদি না সেই মেয়েটি ওরই চোখের সমুখে দ্বিতীয় একজনের কথায় রাজি হয়ে তার সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিত। আর দ্বিতীয় সেই লোকটি শ্বেতাঙ্গ নয়, ফিরিঙ্গি নয়, বাঙালী। ড্যাম, ডার্টি নেটিভ্, হী ওয়াজ এ বেঙ্গলী।

আমিও বাঙ্গালী, কিন্তু মাতালের প্রলাপে রাগ করা চলে না।

তারপর ফ্রেড্রিক উন্মত্তের মত সেই দরজার ওপর ক্রমাগত ঘুষি লাথি চালিয়ে গেছে। বিকট, প্রমত্তস্বরে অশ্লীল চীৎকার করেছে, যতক্ষণ না অন্য লোকজন জড়ো হয়েছে এবং একটা হাতাহাতির পর ওকে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে আসতে হয়েছে।

এই ব্যাপারটা সামরিক আদালত অবধি গড়িয়েছিল। কর্ত্তৃপক্ষ সেই মেয়েটিকে ডেকে পাঠালেন; আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। মেয়েটি এলে দেখলুম, সে মার্থা।

ইতিমধ্যে মার্থা আরো কয়েক ধাপ নেমে এসেছে; অর্থাৎ পুরোপুরি রূপোপজীবিনী হয়েছে। ওর কোটরগত চোখ, বিশুষ্ক কপোল, শীর্ণ, শিরাওঠা হাত পা থেকে ওর এই ক'বছরের ইতিহাস যেন পড়ে নিলাম।

আমার সঙ্গে একবার মার্থার চোখাচোখি হ'ল। কিন্তু আমি যে চিনতে পেরেছি, এমন কোন আভাস দিলুম না।

মার্থাকে যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হ'ল তার নমুনা দিই :—

তোমার নাম ?

মার্থা জনষ্টোন।

পেশা ?

মার্থার উকিল আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মার্থা নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলে।

(ফ্রেডারিককে দেখিয়ে) একে চেন ?

—না।

—ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা এ তোমার কাছে গিয়েছিল ?

—হতে পারে।

—তুমি রাজী হওনি ?

—না।

—কেন ?

উত্তর নেই। আবার প্রশ্ন হ'ল, একথা কি সত্য যে তার কিছুক্ষণ পরেই তুমি অন্য একটি লোকের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিলে ?

মার্থা স্বীকার করলে।

এমনি ধারা জেরা আরো কিছুক্ষণ চলেছিল।

সামরিক আদালতের সিদ্ধান্ত ভালো মনে নেই, সৈন্যটির বিভাগীয় কোন শাস্তি হয়েছিল বোধ হয়। এর কিছুদিন পরে আমরা অন্য এক ছাউনিতে বদ্‌লি হয়ে গেলুম। তারপর তিন বছর শরীরের ওপর দিয়ে কী ঝড়ই গেল ; বর্মার পাহাড়ে, মালয়ের জঙ্গলে, গুয়াদালকানালের খালে বিলে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি, স্বস্তি নেই, বিরাম নেই। সর্বক্ষণ বিমানের গর্জন, কামানের ক্রুদ্ধকণ্ঠে কান দুটো বধির হয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য মানুষ মারা পড়েছে ; তার চেয়ে বেশী আহত হয়ে আর্তনাদে বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। আমরা তাদের সেবা করে

সারিয়ে তুলে ফের রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছি। মৃত্যুর ঘূর্ণীঝড়ে বেতস পত্রের মত কম্পমান আমরা ক'জন জীবনের সব মূল্যবোধ খুইয়েছি।

—আর মার্থা?

সকাল হয়ে এসেছিল। নিজেরটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, ডাক্তারের চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে ডাক্তার একটু হাসলেন, বললেন, সে জীবনে মার্থার স্থান ছিল না ওকে একেবারে ভুলে থাকাই স্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, মার্থার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ত। ভালোবেসে পাইনি সেই হতাশা নয়, ওর বিচিত্র পতনের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাসও নয়। ফ্রেড্‌রিক ঘটিত ব্যাপারের একটা ঘটনা আমাকে চকিত করেছিল, কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না।

—সেটা কি?

ফ্রেডরিককে প্রত্যাখ্যান করে যে লোকটাকে নিয়ে মার্থা দরজায় খিল দিয়েছিল, সে বাঙালী।

—এই ব্যাপারটাকেই এত বড় করে দেখছেন কেন?

—দেখছি এই জন্যে, যে মার্থাকে আমাদের সেনাদলের অনেকেই চিন্‌ত। ফ্রেডরিকের মত কেলেঙ্কারি তারা কেউ করেনি, কিন্তু অনেকেই মার্থার দরজা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। তাদের মুখেই শুনেছি মার্থা বাঙালী ছাড়া আর কাউকে ওর ঘরে ঢুকতে দিত না। অসম্মানের নিম্নতম ধাপে দাঁড়িয়েও এই বিচিত্র আভিজাত্যটুকু সে বজায় রেখেছিল। শ্যামলদাকে ছাড়বার পর আরো দু'জনের কাছে মার্থা রক্ষিতা হয়ে ছিল। তারা দু'জনেই বাঙালী। এমন কি,—ডাক্তারবাবু বললেন,—আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন, কাল যে লোকটি সন্ধ্যায় মার্থার ঘরে ঢুকেছিল, এমনকি টাকার লোভে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটাকে খুন করে পালিয়ে গিয়েছে, পুলিশ ইন্সপেক্টার তার সম্বন্ধে আশেপাশের মেয়েদের জেরা করেছে। ঠিক জানা যায়নি, তবু বর্ণনা থেকে পুলিশের সন্দেহ, সেও বাঙালী।

—অদ্ভুত! আমি বললাম।

আমরা দু'জন তখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। সকাল বেলাকার হিম হাওয়া রাত্রিজাগরণের পর স্নিগ্ধ প্রলেপের কাজ করছিল।

ডাক্তার আমার মন্তব্য শুনতে পাননি। অন্যমনস্কভাবে কতকটা আপন মনেই বললেন,—আমার মনে হয়, জীবনে মার্থা একবারই ভালবেসেছিল, শ্যামলদাকে। তারপর সারা জীবন ধরে অসংখ্যের ভেতর দিয়ে সে যে অনন্য পুরুষের খোঁজ করেছে, সে শ্যামলদা। ওর বিচিত্র প্রাদেশিকতাটুকুর নইলে আর কোন অর্থ হয়না।

কাটা সৈনিক

ইনি আমার বন্ধু অনুপম রায়। লেখক। আর ইনি ইন্দুলতা চতুর্বেদী। এঁর পরিচয় দেবার নিশ্চয় প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলব এমন বর্বর নই। বিশেষ সগুপরিচিতা যখন ভদ্রমহিলা। চিনি বইকি—ভঙ্গিতে মৃদু হেসে নমস্কার করলুম।

ভবেশ আমার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করে থাকবে। সুযোগ পেতেই গলা নামিয়ে বললে, 'অভিনেত্রী।'

বিশেষ সুরাহা হল না। অভিনেত্রী তো এক হিসেবে রমণীমাত্রেই। ভবেশ অবশ্য সহজ অর্থেই শব্দটা প্রয়োগ করেছে। ইনি কোন মঞ্চ কিম্বা পটপটিয়সী হবেন। কিন্তু আমি থিয়েটার দেখিইনে। সিনেমা কালেভদ্রে।

অন্যান্য অতিথিরা আসতে শুরু করেছিলেন। ভবেশকে সেদিকে ছুটতে হল। আমি করি কী। গোটাদুই খালি চেয়ার ছিল। ইন্দুলতাকে তার একটা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলুম।

আসন নিয়েই ইন্দুলতা তাঁর ঝাঁপি খুললেন, বেরল ছোট্ট হাত-আয়না। আমি দেখেও না দেখার ভাণ করে বসে রইলুম এবং মনে মনে আমার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে ধিক্কার দিলুম। সাজ-পোশাকের রুচিহীন বাড়াবাড়িটুকু আগে কেন চোখে পড়েনি। আর কিছু না হোক, ইনি মুখে, সম্ভবত গায়েও, পাউডার যা ঢেলেছেন, তার গন্ধ থেকে জন্মান্ধও বলে দিতে পারত ইনি অভিনেত্রী।

মেরামত যেখানে যেটুকু প্রয়োজন ছিল, সারা হতে মিনিটখানেক লাগল। ইন্দুলতা হাত-আয়নাটা ফের ঝাঁপিজাত করলেন। এতক্ষণ আমাকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি, এবার ভ্রূ নিক্ষেপ করলেন।

'সত্যি করে বলুন ত পরিমলবাবু, আমাকে আপনি কী কী বইয়ে দেখেছেন।'

বললুম, 'পরিমল নয়, অনুপম।'

'ওই হল।' ইন্দুলতা বিন্দু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললেন, 'আমার কোন্ পার্টটা আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাই বলুন না।'

পালাবার পথ নেই। অগত্যা গিরিশ ঘোষ, ডি এল রায় ইত্যাদির বিখ্যাত কয়েকটি নাটকের নায়িকাদের নাম করলুম। ইন্দুলতার হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকল। অনেক পরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনি যে কটা বইয়ের নাম করলেন নিরুপমবাবু, তার একটাতেও আমি নামিনি।'

প্রমাদ গণলাম। হাতেনাতে ধরা-পড়া পকেটমারের গলায় কিছুক্ষণ এলোমেলো কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলুম।—মাপ করবেন, ভুল করেছিলুম, তা ছাড়া শিল্পজগতের* সঙ্গে বিশেষ পরিচয় তো নেই, ইত্যাদি।

ইন্দুলতা ভ্রূকুটি করলেন। 'কিন্তু ভবেশবাবু যে বললেন আপনি লেখক।'

'যেতে দিন। ওটা কথার কথা। যে লেখে সেই তো লেখক। কেরাণীও। রাইটার্স বিলডিঙ নামেই তো তার প্রমাণ।'

কোন ফল হল না। ইন্দুলতার মুখ যে হাঁড়ি, সেই হাঁড়ি। কিছুক্ষণ পরে সেই হাঁড়ির ভেতর থেকে স্বর বেরুল, 'উহুঁ। ভবেশবাবু কখনই সে অর্থে বলেননি। আপনি নিশ্চয় গল্পটল্প লেখেন। কিন্তু আমি—' আমার উপর স্থির, নির্মম দৃষ্টি স্থাপন করে ইন্দুলতা কথাটা শেষ করলেন, 'কিন্তু সত্যি কথাই বলব। আপনার কোন লেখা পড়িনি।'

বিনয়াবনত কণ্ঠে বললুম, 'ওগুলো পড়বার যোগ্যও নয়।'

এর পরে আলাপ জমবে আশা করাও দুরাশা। অথচ খাবার এসে গিয়েছিল, টেবিল থেকে ওঠাও যায় না। সুতরাং প্লেট থেকে একে অপরকে আহার্য তুলে দেওয়া ইত্যাদি কেতামতই চালাতে হল, সেই

ফাঁকে কাটা-কাটা কথাও সব ইস্টিশানে থামা লোকাল গাড়ির মত ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ঢিকুর-ঢিকুর চলতে লাগল।

ইন্দুলতা, লক্ষ্য করলুম, মেয়েরা প্রকাশ্যে যতটা খায় তার চেয়ে বেশিই খেলেন এবং চর্বণ, চোষণ, লেহন ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে উনি নিতান্ত যে সামান্যা নন, আমাকে সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে থাকলেন।

কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত ছিলুম, সুতরাং বাধা দিলুম না।

ইন্দুলতা বললেন ওঁর প্রথম অভিনয় দেখে টেক্কা কলমলিখিয়েরা খবরের কাগজে কী লিখেছিল। কাটিঙ আছে, একদিন আমাকে দেখাবেন। স্বয়ং নটাচার্য কি আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। একবার নাকি অভিনয়ের শেষে ফুলের মালা এত বেশি হয়েছিল যে আলাদা ঘোড়া-গাড়ি ডেকে সেগুলো বাড়ি নিয়ে যান।

মরমে মরে যেতে থাকলুম।

ইন্দুলতা হঠাৎ একবার বললেন, 'আপনি একটা নাটক লিখুন, অরূপবাবু।'

ততক্ষণে বুঝেছিলুম, ভ্রান্তিটা ওর বিলাস। সংশোধন করবার পণ্ডশ্রম না করে নিজেকে পরনামধন্য মনে করাই শ্রেয় বোধ করলুম।

ইন্দুলতা বললেন, 'গল্প লিখে কিচ্ছু হয় না। নাটক লিখুন, যশ, অর্থ এক সঙ্গে হবে।' আমার কুণ্ঠিত মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি চালিয়ে দেব। 'রঙ্গপীঠে'র মালিক প্রসন্ন চৌধুরী আমাকে না দেখিয়ে কোন নাটক ধরান না তো।'

ওঁর সুপারিশ নিয়ে খ্যাতিমান হয়েছেন এমন দু'চারজন তরুণ নাট্যকারের নাম করলেন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভবেশ অন্যান্য অতিথিদের আপ্যায়ন করছিল। ইন্দুলতা সেদিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা, ভবেশ মল্লিকের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ।'

'অনেক দিনের। আমরা কলেজে এক সঙ্গে পড়তুম।'

'ও। আচ্ছা লোকটার বিস্তর টাকা, না।'

'পৈতৃক সম্পত্তি মন্দ পায়নি শুনেছি।'

ইন্দুলতা খিলখিল করে হেসে উঠলেন, 'টাকা আছে সেটা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কি গোল ভুঁড়ি আর কি ফর্সা রং দেখেছেন।'

উত্তর দিলুম না।

ইন্দুলতা বললেন, 'এত টাকা নিয়ে লোকটা কী করবে ভেবে পায় না। আজ পার্টি দেয়, কাল রেসের ঘোড়া কেনে। শুনেছি, কয়েকটা ছবিতে টাকা ঢেলেছিল, কয়েক লাখ লোকসান দিয়েছে। আরো ছবি তুলবে নাকি।'

'ঠিক জানিনে। তুলতে পারে।'

পেয়ালা-প্লেট-পট বাঁচিয়ে ইন্দুলতা আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।—'আপনার তো অনেক দিনের বন্ধু। এক কাজ করুন না। ওকে থিয়েটারের ব্যবসায় নামান। 'নাট্যলোকে'র প্রোপ্রাইটর শুনছি খদ্দের খুঁজছে। বলেন তো কথাবার্তা চালাই।'

বললুম, 'আপনিই ভবেশকে বলুন না।'

ইন্দুলতা যেন ক্ষুণ্ণ হলেন।—'বলতে তো পারি। কিন্তু আমি বললে কি হবে, আপনি হলেন গিয়ে ওর বন্ধু।'

অসহ্য হয়ে উঠছিল। ততক্ষণ আহার পর্ব সারা হয়েছে। কিছুক্ষণ উসখুস করলুম। তারপর এক সময় চেনা লোক দেখতে পেয়েছি ভাণ করে সরে পড়লুম!

পরদিন ভবেশকে ফোনে বললুম, 'কাল আচ্ছা মুশকিলে ফেলেছিলে, যা হোক।'

'কী হল।'

'তোমার এই ইন্দুলতা চতুর্বেদী।'

ভবেশ একমাত্রিক যে ইংরিজি শব্দটা উচ্চারণ করলে তার বাংলা অর্থ কুকুরী। নেহাৎ ইংরিজি বলে তেমন শ্রুতিকটু শোনাল না।

ঠাট্টা করে বললুম, 'কিন্তু নেমন্তন্ন তো করেছিলে।'

ভবেশ বললে, 'আমার কি মাথা খারাপ যে ওকে খেতে বলব। ও গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছিল।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'চতুর্বেদীটা কি ব্যাপার, বল তো।'

'অনুমান করতে পারছ না?'

'বোধ হয় পারছি। এসব মেয়ে কারুর না কারুর রক্ষণাবেক্ষণে থাকে। ওর এখন যে রক্ষক, তার পদবী কি চতুর্বেদী?'

যে উত্তর এল, সেটা বিস্ময়কর।—'ভুল বললে। চতুর্বেদী ওর স্বামীর নাম।'

ইন্দুলতার সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ। বলা বাহুল্য, সেদিন ওকে ভাল লাগেনি। কিন্তু সেই ভাল-না-লাগাটুকু, প্রথম আলাপের বিবরণীতে এত দিন পরেও ফুটে উঠবে ভাবিনি। যেটুকু লিখেছি, ফিরে পড়তে গিয়ে নিজেরই অনুশোচনা হচ্ছে। এ তো আমি লিখতে চাইনি, আমি তো ভুলতেই চেয়েছিলুম একটি বিকেল-বয়সী মেয়ের রুচিবিকারের কথা। চেয়েছিলুম একটি করুণ কাহিনী রচনা করতে; যার ছত্রে ছত্রে গ্রীষ্মার্ত মানুষের দেহের ঘামের মত দরদর দরদ। কিন্তু আমার ভেতরকার অ-খেলোয়াড় মানুষটি এসব কি লিখিয়েছে। এ ক'পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নতুন করে লিখব, এমন ধৈর্য নেই। অতএব যেমন চলছে চলুক।

ইন্দুলতার পরামর্শে নয়, শখে পড়েই একখানা নাটক লিখেছিলুম। আরও চার পাঁচ বছর পরের কথা বলছি। ততদিনে লেখক হিসেবে আমার প্রতিষ্ঠা কিছুটা শিকড় পেয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একটি নামী ইংরিজি কাগজের সঙ্গে যুক্ত। সেজন্যেও প্রাপ্যের চেয়ে কিছু বেশী খাতির পেতুম।

নাটকখানা প্রসিদ্ধ কোন নট এবং পরিচালক পড়তে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একদিন ডেকে পাঠালেন।

কার্ড পাঠালুম, ডাক এল। মাঝখানে মিনিট পাঁচেক সময়

কেটেছিল। এই সময়টা ভিজিটর্স রুমের দ্বিতীয় চেয়ারের অধিকারিণীর দিকে বারবার দৃকপাত করেছি। চিনতে আমার বিন্দুমাত্র দেরি হয়নি, কিন্তু ইন্দুলতা যে চিনতে পেরেছেন, এমন আভাসও দিলেন না। বহুমাস-বাসি একটা মঞ্চপর্দা সংক্রান্ত সচিত্র সাপ্তাহিকে মুখ ঢাকা দিলেন।

প্রসিদ্ধ সেই নট-পরিচালক কাজের লোক। বেশি কথা বাড়ালেন না। বললেন, আমার নাটকটা পছন্দ হয়েছে। পূজোর আগেই মঞ্চস্থ করতে চান। শুধু দু'একটা সংলাপে আপত্তি আছে। আর, দু'একটা জায়গায় যে টেকনিক ব্যবহার করেছি, সেটা ঠিক সেভাবে ফুটিয়ে তোলার মত স্টেজ ইকুইপমেণ্ট ওঁদের নেই। ওঁদের কেন, এদেশে কারুরই নেই। আমার অনুমতি নিয়ে সেগুলো ঈষৎ বদলাতে চান। কি ভাবে, তাও বললেন।

সানন্দে সম্মতি দিলুম।

পরিচালক বললেন, 'আর একটু অসুবিধে আছে। উপযুক্ত অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাব। আগেকার দিনে, মশাই, এসব হাঙ্গামা ছিল না। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক, জমকালো পোশাকেই লোকে প্রথম ঘায়েল হত। তারপর লম্বা লম্বা বক্তৃতা, একটু চেঁচাতে পারলেই, ব্যস। আর আজকাল আপনারা শুধু কাটা-কাটা কথা বসিয়ে নাটক লেখেন; সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ব্যাপার,—যাদের শুদ্ধ করে বাংলা উচ্চারণ শেখাতে ছ' মাস কেটে যায়, তাদের দিয়ে এসব কি করে ফোটাই বলুন ত।'

পাছে এই ছুতোয় গোটা নাটকটাই না-মঞ্জুর হয়ে যায়, তাই ভয়ে ভয়ে প্রসঙ্গ বদল করলুম।

'আচ্ছা ইন্দুলতা চতুর্বেদী কি এখন আপনাদের স্টেজে আছেন?'

'কে ইন্দুলতা চতুর্বেদী?'

'অভিনেত্রী। আসবার সময় তাঁকে যেন দেখলুম।'

পরিচালকের ততক্ষণ মনে পড়েছে। ভবেশ মল্লিক ইংরিজিতে

যা বলেছিল, ইনি বাংলায় ততোধিক অভদ্র একটা, শব্দ উচ্চারণ করলেন।

'জ্বালিয়ে খেলে মশাই। আমরা দুষ্কুল থেকে স্ত্রীরত্ন সযত্নে আহরণ করি বটে, কিন্তু রূপ দেখে, নয়ত গলা শুনে। এর কোন্‌টা ওর আছে। নইলে শুনেছেন কোথাও একটা মেয়ে দশ-বার বছর ধরে শুধু মাইনর রোলেই প্লে করে গেল?'

সবিনয়ে বললুম-এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা সামান্য।

পরিচালক বললেন, 'এখন শখ হয়েছে উনি হীরোইন হবেন। চ্ছুঃ।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, পেছন থেকে ডাক এল, 'শুনুন।'

দাঁড়াতেই ইন্দুলতা তরতর করে নেমে পাশাপাশি এলেন। বললেন 'চিনতে পারছেন?'

একটা গর্হিত কর্ম করলুম। বললুম, 'না তো। কোথায়,—কোথায় যেন। শিমূলতলায়? বুঝেছি, নিশ্চয় কোন ওয়েটিং রুমে—'

রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে গিয়ে পাউডারও মুছে গেল, ইন্দুলতার খেয়াল নেই, বললেন, 'সেই যে ভবেশ মল্লিকের বাগান পার্টিতে আলাপ হয়েছিল।'

'হয়েছিল নাকি। তা আপনি এখানে—'

'ওরা ডেকেছিল। নতুন নাটক খুলবে, আমাকে পার্ট দিতে চায়। কিন্তু যে পার্ট দিতে চাইছে সেটা নিতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। যদি অমিতার পার্টটা দিত, তবে বিবেচনা করতুম।'

নিরাসক্ত কণ্ঠে বললুম, 'বেশ, তবে নেবেন না।'

এতক্ষণে ইন্দুলতার মুখোশ খসে পড়ল।

ততক্ষণ প্রায় রাজপথে এসে পড়েছি। ইন্দুলতা সেখানে, প্রায় সর্ব সমক্ষে, আমার সম্মুখে জোড়হস্তে বললেন, 'আপনি একটু ওদের বলে দিন না।'

আমি? আমার কি হাত আছে।

ইন্দুলতা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'আপনি মিছিমিছি লুকোচুরি

করছেন। আমি সব খবর নিয়েছি। এ নাটকটা তো আপনার লেখা, না ?'

অস্বীকার করে লাভ ছিল না। সোজাসুজি বললুম, 'কিন্তু আপনার অভিনয়কুশলতা কেমন সে বিষয়ে আমি কিছুই জানিনে। এসব ব্যাপার থিয়েটারের মালিকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল, না ?'

ইন্দুলতা তবু নাছোড়। 'আপনি আমার বাসায় একদিন চলুন আপনার পাণ্ডুলিপি নিয়ে। আমি পড়ে আপনাকে শুনিয়ে দেব অমিতার চরিত্রটি ঠিক ধরতে পেরেছি কিনা।'

নিষ্কৃতি পাবার জন্যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই প্রতিশ্রুতি দিলুম।

ইন্দুলতা একটি ঘোড়াগাড়িকে হাতছানি দিলেন, আমি সেই অবসরে ট্রামে উঠলুম।

ইন্দুলতা চতুর্বেদীর জীবনকথা লিখতে গিয়ে মুশকিলে পড়েছি। জীবনী হয় প্রাতঃস্মরণীয়দের নিয়ে। ইন্দুলতা তা নন। সায়ংস্মরণীয়াও নন। ওঁকে দেখার জন্যে বেলা পড়তে না পড়তে থিয়েটারের বুকিং-ঘরের সম্মুখে গিলেকোঁচা বাবুদের হাতাহাতি হয় না। জমজমাট কোন কোন দৃশ্যে জুৎসই দু'চার কথা বলবার সুযোগ যদিবা পান, হাততালি মোটে পান না। তবু সুরেশ্বরী কিম্বা অপরা কোন নাট্যসম্রাজ্ঞীকে নিয়ে না লিখে ইন্দুলতাকেই কেন বেছে নিলুম, তার কারণ ছিল। সে কারণ, আর কিছু নয়, ইন্দুলতারই অনুরোধ। সে কথায় পরে আসছি।

আমার নাটকে ইন্দুলতা অভিনয় করেছিলেন। নায়িকার ভূমিকায় নয়; তবে তাঁর অংশও উল্লেখযোগ্য। আমারই অনুরোধে পরিচালক ইন্দুলতাকে এই ভূমিকার জন্যে নির্বাচন করেছিলেন। হেসে বলেছিলেন, 'আচ্ছা। কিন্তু দেখবেন, নাটক ঝুলে গেলে আমাদের দোষ দেবেন না।'

ঝুলে যায়নি, বরং ভালই উতরেছিল। ইন্দুলতা প্রাণ দিয়ে অভিনয় করেছিলেন। সেই সূত্রে ওঁর বাসায় আমাকে কয়েকবার যাওয়া-আসা

করতে হয়। তখন হঠাৎ একদিন ইন্দুলতা বলে বসলেন, 'কতই তো নাটক লিখলেন, এবার আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন।'

বললুম, 'আপত্তি নেই। কিন্তু কিছু যে প্রায় জানি না।'

'জানেন না?' ইন্দুলতা একটু চুপ করে থেকে কি ভাবলেন।—'আচ্ছা, এ বাড়িখরচ কে যোগায়, জানেন?'

জানতুম না। তবে লোকমুখে বড়বাজারের বিশিষ্ট কোন ব্যবসায়ীর নাম শুনেছিলুম। সেটা উল্লেখ করতে রুচিতে ঠেকল। বললুম, 'কে আবার যোগাবে, সব নিশ্চয় আপনার উপার্জনেই চলছে। আপনি নিপুণা অভিনেত্রী।'

ইন্দুলতা হেসে উঠলেন, 'আপনি কিন্তু মোটেই নিপুণ অভিনেতা নন অনুপবাবু, কপটতা আপনার চোখে, মুখে, কণ্ঠস্বরে। আপনি জানেন থিয়েটার করে আমি সামান্যই পাই, আপনার নাটকটার আগে দুটো সীনে নামবার মত পার্টও আমার জোটেনি। তাতে আসে এত আলমারি, কৌচ, আসবাব? তোরংভর্তি জামাকাপড়? বলুন, আসে?'

আসে না সে-কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। ইন্দুলতা বললেন, 'এসব যে জোগায়, তার নাম আপনি সামান্য সন্ধান নিলেই জানতে পারবেন। কিন্তু—' একটু থেমে ইন্দুলতা বললেন, 'তিনি চতুর্বেদী নন। অবাক হচ্ছেন না?'

হয়েছিলুম প্রকাশ করিনি। সভ্য শহুরে মানুষ, আমাদের সমাজে বেমাত্রা কৌতূহল বে-আইনি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুজনের বেতন কত জিজ্ঞাসা করতে পর্যন্ত ভরসা পাইনে, সামান্য-চেনা স্ত্রীলোকের অতীতের কেঁচো খুঁড়ে সাপ বার করতে যাব কোন ভরসায়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ইন্দুলতা বলেছিলেন, 'বলব, আমার জীবনকথা আপনাকে বলব। আজ নয়, আরেকদিন।' স্বরে বুঝি গভীরতার ছাপ পড়েছিল, সচেতন হতেই ইন্দুলতা লজ্জায় হাসলেন, তারপর সেই লজ্জাটুকু চাপা দিতেই বুঝি হঠাৎ-জোরে—'বলব, তবে

সর্ত আছে। একটা নাটক লিখতে হবে আপনাকে। অভিনয় করে অমর হতে তো পারলুম না, আমার জীবন নিয়ে লেখা নাটকের ভেতর দিয়ে যদি পারি।'

পেশাদার নাটক লিখিয়ে নই, অন্য কাজের চাপও প্রচুর, থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। ইন্দুলতার অতীতের কথা শুনব কি, তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতই বিশেষ হত না। নতুন নাটক লেখা হয়ে ওঠেনি, পুরণোটারই অভিনয় কদাচিৎ হয়, দেখতে যাওয়ার উৎসাহ পাইনে।

হঠাৎ প্রায় আট ন'মাস বাদে ইন্দুলতার কাছ থেকে ডাক এল। ছোট্ট চিঠি, 'আজ অবশ্য একবার আসবেন।' পত্রবাহককে বলে দিলুম যাব।

সেদিন রবিবার, যথাপ্রতিশ্রুতি যখন গিয়ে পৌঁছলুম তখন বৃষ্টি-টিপটিপ দুপুর। তবলা মেরামতের দোকানের পাশ কাটিয়ে, পানের দোকানের জল-চোঁয়ানো ঝাঁপ বাঁচিয়ে কোনমতে কাছা কোঁচা এবং ভদ্রতা সমেত নির্দিষ্ট দরজায় টোকা দিলুম।

পম্প-শু চৌকাটের বাইরে রাখতে হল। ইন্দুলতা ফর্সা তোয়ালে ধুতি ইত্যাদি এনেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতলবিত্ত, অমিতাচারী, মধ্যদেশের গুরুতাহেতু স্তোকনম্র একটি প্রৌঢ়ের ছবি চোখের সমুখে ভেসে উঠল, তার খোলস অঙ্গে তুলতে প্রবৃত্তি হল না।

নীচু একটা তক্তপোষে ফরাসমত একটা চাদর পাতা, ঘরে দ্বিতীয় আর আসন নেই। সেদিকেই আঙুল দেখিয়ে ইন্দুলতা বললেন, 'বসুন পরিমলবাবু।'

বলতে যাচ্ছিলুম 'অতিশয় অসময়ে অভাজন' পরে অযাচিত অনুগ্রহ।' কিন্তু ফোলা-ফোলা দুটি পাতার নিচে আরক্তিম দুটি চোখের দিকে তাকাতে পরিহাসটা রসনাগ্রেই ঠেকে রইল। ফরাসে একটি মাত্র তাকিয়া, সেটা তুলে নিতেই দেখি ভাঁজে ভাঁজে দু'একটি ভিজে চুল, অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগ। ইন্দুলতা এতক্ষণ কাঁদছিলেন নাকি।

উঠে গিয়ে ইন্দুলতা দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন, রাস্তার দিকের জানালাটা তবু খোলা রইল। ভারী ভারী গলায় ইন্দুলতা বললেন, 'আজ আমার জীবনের কাহিনী আপনাকে শোনাব। সেই জন্যেই ডেকেছি।'

বাইরে তাকিয়ে দেখলুম তখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ময়লা মেঘের চাদর মুড়ি দেওয়া আকাশ, ক্বচিৎ রাস্তায় ঠুনঠুন একটা রিক্সা, বয়সখোয়ানো একটি স্ত্রীলোকের আত্মকাহিনী শোনবার পক্ষে পরিবেশ মন্দ না। তাকিয়াটা আরও কাছে টেনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলুম।

বললুম, 'এবার শুরু হোক।'

ইন্দুলতা দু'চোখে তিরস্কার ভরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিলুম। একি বাইজির কাছে এসেছি যে ফরমাস দিলেই গান শুরু হবে।

অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কিছুক্ষণ কাটল। বৃষ্টির টুপটাপ, রিক্সার ঘন্টি, তবলা মেরামতের দোকান থেকে ভেসে আসা কাটাকাটা বোল চেতনার সঙ্গে একাকার, কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল করিনি। আমার সমুখেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ইন্দুলতা বসে, অযত্নবিন্যস্ত একটি খোঁপার সানুদেশে কমনীয় একটি গ্রীবা, সেখানে বয়সের গণিত নেই, আমার অর্ধচেতন উপলব্ধিতে এসব কিছুই ছিল না। সময়হীন জ্যোতিহীন প্রদোষে নিরবয়ব দুটি সত্তা যেন মুখোমুখি, মাঝখানে কারণহীন মৌন।

জানুমগ্ন মুখখানি তুলে ইন্দুলতা অকস্মাৎ কুণ্ঠিত হাসলেন। 'কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছিনে। জানেন ত', আমরা অভিনেত্রী, কথা মুখস্ত করে বলা অভ্যাস, তৈরী করে বলতে শিখিনি।' বলতে বলতে ইন্দুলতা উঠে পাশের ঘরে গেলেন, সেদিনকার কতকগুলো খবরের কাগজ এনে বললেন, পড়েছেন?'

ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে বললুম, 'স্পৃহা নেই। সিমলা কনফারেন্স, ফাটকা বাজার, উইম্বলডন টেনিস, এসব আজকের জন্যে নয়।'

ইন্দুলতা বললেন, 'আরও খবর আছে।' প্রথম এবং দ্বিতীয় পাতা

উল্টে গেলেন। পঞ্চম পৃষ্ঠায় ওপরের দিকে একটি সংবাদ, 'পরলোকে ডাঃ চতুর্বেদী।'

সবটুকু পড়বার আগেই বিমূঢ় কণ্ঠে বলে উঠলুম, 'ইন্দুলতা দেবী, এই ডাঃ চতুর্বেদীই কি আপনার—'

নতমুখে ইন্দুলতা বললেন, 'স্বামী।'

আবার সেই মূক অস্বস্তি। আলাপের সূত্র জোড়া লাগাতে কিছুক্ষণ পরে বললুম, 'আমার বোঝা উচিত ছিল। আপনার নামের পদবীই ত'—'

'সবটা বুঝতেন না' ইন্দুলতা স্থির দৃষ্টি আমার চোখে রেখে বললেন, 'যে মেয়ে অনায়াসে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসে, সে সারাজীবন তার পদবীটুকু আঁকড়ে থাকে কেন ভেবেও কিনারা পেতেন না।'

উত্তর না দিয়ে সায় দিলুম।

ইন্দুলতা বললেন, বিয়ের পর প্রথমরাত্রি থেকেই শুরু করি, আপনার নাটকে যেমন ইচ্ছে সাজিয়ে নেবেন। অল্পবয়স, পাশে না-চেনা একজন লোক, চেহারাটা পর্যন্ত ভাল করে দেখিনি, ভয় ছিল প্রথম আলাপ না-জানি কেমন হবে। সেই সঙ্গে কৌতূহল। হয়ত কথাই হবে না, অতর্কিত একটু স্পর্শেই সব বলাবলি হয়ে যাবে। রাঙা চেলী জড়ান পুঁটুলীটি হয়ে শুয়ে আছি, ঘামে সারা শরীর নেয়ে যাচ্ছে, দাঁতে ঠোঁট চেপে প্রতিজ্ঞা করছি চেঁচিয়ে উঠব না, কেননাআশেপাশেই অনেকগুলো কান আড়ি পেতে আছে, হাসাহাসি পড়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে ওদিক থেকে সাড়া এল। কড়িকাঠের দিকে তাকাবেন না পরিমলবাবু, সঙ্কোচের দরকার নেই। কাছে টেনে নেওয়া নয়, মুখখানি তুলে ধরে জানা-নাম আরেকবার জানবার আবদার নয়, মনে আছে, প্রথমেই উনি বলেছিলেন, 'কতদূর পড়েছ।'

পড়েছিলুম, থার্ড ক্লাশ অবধি, তাও শেষ দু'বছর বাড়িতে। কোলের ভাইটিকে ধরা, মার চড়ান ভাতের হাঁড়ি নামানর রান্নার শিক্ষানবিশির ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পেতুম, বইটই নাড়াচাড়া করে দেখতুম।

সেকথা স্বীকার না করে বাড়ির লোকের পরামর্শ স্মরণ করলুম। বললুম, 'ম্যাট্রিক অবধি।'

উনি বললেন, 'মোটে!' কণ্ঠস্বরে যে তাচ্ছিল্য ছিল, আমি যে এখন অভিনেত্রী, আমিও ফোটাতে পারব না। কিছুক্ষণ পর উনি ফের বললেন, 'আমি তোমাকে পড়াব।'

হতাশ অনেকগুলো চোখ দরজা জানালার ফোকর থেকে সরে গেল, টের পেলুম। সে রাত্রে আর কোন কথা হল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ইন্দুলতা বোধ হয় পরবর্তী ঘটনাগুলো গুছিয়ে নিলেন।

বই এল। আপনাকে ছুঁয়ে বলছি ভাই, সেসব বই পড়তে ভাল লাগত না। বিয়েতে অনেকগুলো নভেল পেয়েছিলুম, দু'একখানা কবিতার বইও বোধহয় ছিল। সেগুলোই পড়তুম।

একদিন ধরা পড়লুম হাতে-হাতে। লুকোতে গিয়েও পারিনি। কলেজ থেকে হঠাৎ ওরকম সময় ফিরবেন তা কি জানতুম। কি বই দেখি, বলে ছিনিয়ে নিলেন। মলাট আর প্রথম পৃষ্ঠা দেখেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, 'ট্র্যাশ। তোমার টেষ্ট এত নীচু, ছি-ছি।'

বেড়াতে যাবার কথা ছিল, হল না। পড়াতে বসবেন ঠিক ছিল, কিন্তু বাইরের পোষাক না ছেড়েই ফের কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

মনে মনে হেসেছিলুম। ভয়ও পেয়েছি। এত তুচ্ছ কারণে এত রাগ কেউ করে। তবু সেদিন ভরসা ছিল, কথা খোলাখুলি বললে খুবই খারাপ শোনাবে পরিমলবাবু, হয়ত কানে আঙুল দেবেন, কিন্তু থিয়েটারের এ্যাকট্রেসের আবার রুচি—আমার বয়স, আমার যৌবন। গুণে যদি নাও পারি, রূপ দিয়ে একটা পুরুষকে ঠিক ভোলাতে পারব।

সে ভুল ভাঙল কিঙ্কিণী সিকদারকে দেখে। তার চেহারা কেমন ছিল বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না, তবু আপনাকে আইডিয়া দিচ্ছি, নাটকে ও চরিত্রটি আনবেন না। ও ভূমিকায় অভিনয় করবার মত মেয়েমানুষ গোটা কলকাতার থিয়েটার-পাড়ায় নেই। কিঙ্কিণী কালো

ছিল। অমাবস্তার মত নয়, কবিত্বটুকু ক্ষমা করবেন, কৃষ্ণা চতুর্দশীর সঙ্গে বোধহয় একটা তুলনা হতে পারে।

কিন্তু রঙ ধুয়ে কি জল খাবে। অমন কমনীয় অথচ বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ আমি দুটি দেখিনি। আর শরীরের গড়ন। থাক এসব কথা শুনতে বোধহয় আপনার অস্বস্তি হচ্ছে।

দুপুর বেলা খেয়ে উঠে পান চিবুচ্ছিলুম বড় একটা আয়নার সামনে। দেখছিলুম ঠোঁট টুকটুকে হলে আমায় কেমন দেখায়। কার যেন ছায়া পড়ল। চমকে ফিরে চাইতেই দেখলুম কিঙ্কিণীকে। তখনও অবিশ্যি নাম জানতুম না।

বললে, 'নির্মল নেই?'

দাদা বলে না, বাবু বলে না, সরাসরি আমার স্বামীর নাম ধরে ডাকে, এ-মেয়ে তো সোজা নয়। জবাব দিতে বোধহয় দু'পলক দেরি হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটি হেসে উঠল। তখনও ঘরে ঢোকেনি, চৌকাটে দাঁড়িয়ে। বললে, 'তুমি নিশ্চয় নির্মলের বৌ। নির্মলটা বেছে বেছে শেষ পর্যন্ত কচি মেয়ে বিয়ে করে আনল। তা নির্মল বেরিয়ে গেছে, না তাকেও শাড়ি গয়নার মত তোমার তোরংয়ে পুরে রেখেছ?'

বললুম, 'আপনি—'

বললে, 'আমাকে চিনবে না ভাই, আমার নাম কিঙ্কিণী। নির্মলের সঙ্গে এক সঙ্গে কলেজে পড়তুম।'

বললুম 'বসুন।'

বসল না, দাঁড়িয়ে থেকেই আমাকে যেন খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। চোখ নয়, যেন দুঃশাসনের দুটি হাত।

আমি ওকে দেখছিলুম। বুঝতে দেরি হয়নি মেয়েটা বড় অহঙ্কারী। পাউডারের একটু গুঁড়ো পর্যন্ত নেই, ওর নিকষ কালো রঙটাও বড়াই করে দেখাচ্ছে। গোয়ালারা দুধে জল মিশিয়ে ফিকে করে, দাম বাড়ায়। মেয়েরাও কালো রঙ ফিকে করতে পাউডার মেশায়, উদ্দেশ্য এক—পুরুষের চোখে দাম বাড়ান। এ মেয়ের সে চেষ্টাটুকু পর্যন্ত নেই।

কিঙ্কিণী বললে, 'হাঁ করে কী দেখছ ভাই, আমি কি খাঁচায় পোরা জানোয়ার।'

বললুম, 'দেখছিলেন তো আপনিও। খাঁচার কথা যখন তুললেন তখন বলি। ঘরের বৌ, খাঁচায় বন্ধ হয়েছি তো আমি।'

'তুমি তো বড় কুঁদুলে ভাই।'

রাগে হুঁশ ছিল না, বললুম, 'তবেই দেখছেন আমাকে যত কচি মেয়ে মনে করেছেন, আমি তত কচি নই।'

কিঙ্কিণী রাগ করল না, মুচকি হাসল। পরে বুঝেছিলুম, আমাকে ক্ষেপাতেই ও এসেছিল। ওর নিকষে ঘষে পরখ করতে চেয়েছিল, আমি কতটা মেকি।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, ইলেকট্রিক পাখা ছিল, তবু একটা খবরের কাগজ ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল। বলল, 'একটু বসি। নির্মল এখুনি ফিরে আসবে, কী বল। ঘরে নতুন বৌ।'

গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে বললুম, 'ঠিক কি। আপনার মত সহপাঠিনী আর ক'জন আছে জানি না; থাকলে হয়ত সারারাত—'

হঠাৎ হাওয়া খাওয়া বন্ধ রেখে কিঙ্কিণী ফিরে তাকালে; স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তুমি জান নির্মলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল।'

এবার মনে মনে আমার হাসবার পালা। এই তো, নখের সামান্য আঁচড়েই আসল কুঁদুলে মেয়েমানুষটি তো তোমার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কি জবাব দেব ঠিক করার আগেই উনি ঘরে এসে পড়লেন। মাথায় ঘোমটা টেনে আমি ঘর থেকে বাইরে এলুম। বারান্দাটা পার হতে হতে কানে এল, 'তোমার বৌ কিন্তু ভারি ঝগড়াটে নির্মল। ঠিক পাড়াগেঁয়ে খুড়িঠানদিদের মত।'

ওঁর জবাবটুকু শোনবার জন্যে কান পাতলুম। সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ছুঁড়ে দেবার মত তাচ্ছিল্যের স্বরে উনি বললেন, 'হবেই তো। লেখাপড়া তো শেখেনি।'

সেদিন কিঙ্কিণী যতক্ষণ ছিল, ও-ঘর মুখো হইনি। চাকর ওদের গিয়ে চা দিয়ে এসেছিল।

বৃষ্টি ধরে এসেছিল। আমাকে উসখুস করতে দেখে ইন্দুলতা কটাক্ষ হানলেন 'এত ব্যস্ত কেন।'

বললুম, 'এভাবে চললে, আপনার কথাটা যে সারা রাতেও ফুরবে না।'

'সেই জন্যে ? বাঁচলুম।' ইন্দুলতা হাসলেন, কিন্তু সে-হাসির সুতোয় অবিশ্বাসের ছুঁচ পরান। 'সারা রাতে গল্প ফুরবে না। সেই সঙ্গে সারা রাত একটা এ্যাকট্রেসের ঘরে রাত কাটাতে হবে, এই তো আপনার ভয় অনুপমবাবু? কিন্তু পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রস্তাবনাটুকু মাত্র আপনাকে বলেছি। সেদিন রাত্রে ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিঙ্কিণীর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ।'

উনি অন্যমনস্কভাবে কী ভাবছিলেন। বললেন, 'দিন ? দিন না, বছর। প্রায় দশ বছর। ওর সঙ্গে আমি পড়তাম। কেন, কিঙ্কিণী তোমাকে বলেনি ?'

কঠিন স্বরে বললুম, 'বলেছে। তবু তোমার মুখে শুনতে চাই। কিঙ্কিণীকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।'

নিষ্প্রভ আলো, উনি কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়েছিলেন, তবু টের পেলুম, চমকে উঠলেন। চট্ করে জবাব দিতে পারলেন না। অনেক পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'অনেকের জীবনে বড় আদর্শ থাকে। সব মেয়ের জন্ম শুধু রাঙা চেলি আর শাঁখা সিঁদুর পরার জন্যে নয়।'

রোষে বিদ্বেষে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললুম, 'রাঙা চেলি পরার দুর্ভাগ্য যাদের হয়েছে, তাদের বুঝি শুধু টিটুকিরিই প্রাপ্য।'

উনি বললেন, 'তুমি যে-সব বই পড়, সেই নাটক-নভেল থেকে যে এসব কথা মুখস্থ বলছ। তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেব না।'

পরে জেনেছিলুম, উনি ওষুধপত্র নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে একটা ল্যাবরেটরি খুলেছেন। সেখানে কিঙ্কিণী ওঁর সহকারী। সে-ল্যাবরেটরি

এখন ওষুধপত্র তৈরির বড় একটা কারখানা হয়েছে! নাম বললেই বুঝতে পারবেন।'

ইন্দুলতা বললেন, এর পরের গোটা কয়েক দৃশ্য বাদ দিয়ে বলি। আমার প্রশ্নের জবাব উনি দেননি, কিঙ্কিণী দিয়েছিল। আমাদের বাসায় প্রায়ই আসত। বেশির ভাগ সময়ই ওঁর সঙ্গে থাকত। কী কথা হত, তার এক বর্ণ বুঝতুম না। আড়ি অনেক পেতেছি।

মাঝে মাঝে কিঙ্কিণী বলত, 'যাই তোমার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করে আসি নির্মল। না-জানি বেচারী একলাটি রান্নাঘরে কী করছে।'

তাড়াতাড়ি চলে আসতুম রান্নাঘরে। তরকারী চাপিয়ে গিয়েছিলুম। ধরে গিয়ে ধোঁয়া উঠছে।'

কিঙ্কিণী একটু পরেই হয়ত এল। পিঁড়ি পেতে বসল কাছে। 'গল্প করতে এলুম কনে-বৌ। ওমা, তরকারী পুড়িয়ে ফেলেছ?'

অকারণেই খুন্তিটা কড়ার পিঠে জোরে জোরে ঠুকতুম। মনে মনে বলতুম, 'আমার কপালের চেয়ে বেশি না।'

একদিন কিঙ্কিণীকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসাই করে বসলুম, উনি আপনাকে বিয়ে করলেন না কেন।

ওর চোখের টলটলে মণি দুটো যেন কৌতুকে নেচে উঠল। 'বিয়ে? নির্মল অমাকে বিয়ে করেনি কেন? তাই বুঝি বুঝিয়েছে তোমায়? আসলে ওকে বিয়ে করিনি আমি।'

'কেন?'

কিছুক্ষণ ইন্দুলতা আমার দিকে চেয়ে রইল। বলল, 'বললে বুঝতে পারবে? বিয়ে করবার জন্যে যে দৈহিক যোগ্যতা চাই, আমার সেটা নেই।'

বোকার মত বললুম, 'কেন রূপ ত আপনার যথেষ্টই—'

বাধা দিয়ে বললে, 'রূপের কথা বলিনি, স্বাস্থ্যের কথা। যা আমি কোনদিন হতে পারব না।'

'কী করে জানলেন।'

শীতল, স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে কিঙ্কিণী বললে, 'আমি ডাক্তার। জানি। এও জানি, সন্তান না পেলে নির্মলকে বেশি দিন ধরে রাখা যেত না। ও দু'দিনে ক্লান্ত হয়ে উঠত।'

এর মাসখানেক পরে কাগজে খবর ছাপা হল, ওদের কারখানার প্রথম পেটেণ্ট ওষুধ বেরিয়েছে। দুরারোগ্য কী একটা ব্যাধির ধন্বন্তরি। ওঁর নামের ঠিক নীচেই কিঙ্কিণীর উল্লেখ। 'ডাঃ চতুর্বেদীর গবেষণায় সহায়তা করিয়াছেন তাঁহার সহকর্মিনী ডাঃ কিঙ্কিণী সিকদার। এই অভিনব আবিষ্কারের কৃতিত্বের অর্ধাংশ ইহারই প্রাপ্য।' কাটিংটা রেখে দিয়েছিলুম, এখনও আছে। আপনাকে দেখাই।

বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক। আপনি বরং আলোটা জ্বেলে দিন।'

ইন্দুলতা উঠে গিয়ে সুইচ টিপে দিলেন। বললেন, 'সেই দীর্ঘ বিবরণীর কোথাও আমার নাম নেই। থাকবার কথাও না। স্বামীর বিছানার অর্ধেক আমি পেয়েছি, কিন্তু গৌরবের অর্ধেক পেয়েছে কিঙ্কিণী সিকদার। সেদিন খবরের কাগজটার পাতায় দীর্ঘ নখের আঁচড় টেনেছি, আর ভেবেছি, এটা শুকনো কাগজ না হয়ে যদি কিঙ্কিণীর মুখ হত! ক্ষত বিক্ষত করে দিয়ে ওর শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে গায়ের জ্বালা জুড়োতে পারতুম। কাগজটাকে কুটি-কুটি করে ছিঁড়লুম, পরে আবার আরেকটা আনিয়ে যত্ন করে কেটে কাটিং রেখে দিলুম।'

বললুম, 'শোধ নেবার অন্য উপায়ও ত ছিল। কিঙ্কিণীই আপনাকে তার ইঙ্গিত দিয়েছিল।'

ইন্দুলতা বললেন, 'মা হয়ে? লজ্জার কথা আপনাকে বলব কি, সে-চেষ্টাও বাকি রাখিনি। কিন্তু কিঙ্কিণীই আমাকে মা হতে দেয়নি।'

বন্ধ্যার কক্ষের কড়িকাঠগুলো ইন্দুলতার গম্ভীর স্বরে কেঁপে উঠল। বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলুম, প্রশ্ন করলুম না।

অনেকদূরের কোন বাড়ি থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বাজছে। ইন্দুলতা কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলেন।

—বধূরূপে যাকে পাইনি, জননী হয়ে তার মনোহরণ করব এ দুরাশা

যেদিন সত্য হবার সম্ভাবনা হল, সেদিন বিস্ময়ে পুলকে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম। তখনও সন্দেহ ছিল, ওঁর কাছে তাই ভাঙিনি। কিন্তু ধরা পড়ে গেলুম কিঙ্কিণীর কাছে। একে মেয়েমানুষ, তায় ডাক্তার, ওর চোখ এড়াব সাধ্য কী। প্রশ্ন করলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর চোখ টিপে বললে, 'বুঝেছি।'

বাধা মানল না, গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করল। পায়ের পাতা টিপল, চোখের পাতা টেনে দেখল। বলল, 'এক ফোঁটা রক্ত নেই যে। তোমাকে একটা ওষুধ দেব ভাই, টনিক। খেলে বল পাবে। ভয় পেও না, সব ভালভাবে হয়ে যাবে।'

ভয় পাইনি, কিন্তু ওর মনের কথা জানা থাকলে পেতুম। ও আমাকে ওষুধ দেয়নি পরিমলবাবু, দিয়েছিল বিষ। আমাকে মারতে নয়—তা-হলে ত সব জ্বালাই জুড়ত—আমাকে নিষ্ফলা করতে।

স্তম্ভিত কণ্ঠে বললুম, 'কী করে জানলেন। আপনার ভুলও ত হতে পারে।'

পারে। কিন্তু হয়নি। একবারই হয়েছিল যখন ওর দেওয়া ওষুধ ডোজের পর ডোজ ঢক ঢক করে গিলেছি। খেলেই কেমন মাথা ঘুরত, তবু খেতুম, বল হবে।

সপ্তাহ-ও ঘুরল না, একদিন কলতলায় পড়ে গেলুম।

অজ্ঞান হয়ে কদিন হাসপাতালে ছিলুম জানি না, যখন চোখ মেললুম, দেখি উনি পাশে দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে বললুম, আমার ছেলে?

উনি কপালে হাত রাখলেন। শান্ত হও।

সে-স্পর্শ যেন তপ্ত অঙ্গারের মত মনে হল। হাতখানা ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, 'আগে বল, কোথায় রেখেছ তাকে।'

উনি অবিচলিত স্বরে বললেন, 'সে ত আসেইনি। তোমাকে যে ফেরাতে পেরেছি, এই ঢের।'

কিঙ্কিণী পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে, 'কলতলাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তোমারও আশা ছিল না বৌ। হাসপাতালের সার্জন

সমাজের সঙ্গে তখনও নোঙর বাঁধা ছিল। সেটুকুও ছিঁড়লুম, বিয়ের পাওয়া গহনার পুঁটুলী নিয়ে ভবানীর সঙ্গে দর্জিপাড়ায় বাসা নিলুম।

গল্পে বাধা দিয়ে বললুম, 'ইন্দুলতা দেবী, আপনার বাবা-মা খোঁজ-খবর নিলেন না? থানা-পুলিশ?'

'নাঃ। কোথায় আর। শ্বশুরবাড়ী ফিরে গেছি···ওঁরা নিজেদের মান বাঁচাতে এই কথাটা রাষ্ট্র করে দিয়েছিলেন। মা যে-কদিন বেঁচেছিলেন, আমার মুখদর্শন করেননি।'

'আপনার স্বামী?'

'প্রথম যেদিন ছোট্ট একটু পার্টে নামলুম, সেদিনই খবরের কাগজে পড়লুম, উচ্চতর গবেষণার জন্যে উনি বিলেত যাবেন। সঙ্গে যাচ্ছে কিঙ্কিণী।'

আস্তে আস্তে হাই তুললেন ইন্দুলতা, মুখগহ্বরের সমুখে হাতের পাতা এনে সেটুকু ঢাকলেন। হঠাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমার অভিনীত নাটকের সমালোচনা কাগজে-কাগজে ছাপা হয়েছিল সেই সঙ্গে ছবি। আমার পরিচয় দিতে গিয়ে সবাই লিখেছিল, ইনি বিশিষ্ট ভদ্র কুলবধূ, বিজ্ঞানব্রতী ডাঃ চতুর্বেদীর সহধর্মিণী। সেদিন কী উল্লাসে আত্মহারা হয়েছিলুম, আপনাকে আজ বোঝাতে পারব না অনুপমবাবু। পেয়েছি, যা চেয়েছিলুম। স্বামীর গৌরবের এক কণা ভাগ পাইনি, কিন্তু তাঁকে আমার কলঙ্কের ভাগীদার করতে পেরেছি। তারপর যতবার ছাপা হয়েছে আমার নাম, পোষ্টার পড়েছে দেয়ালে দেয়ালে, ইন্দুলতার সঙ্গে চতুর্বেদীটুকু যোগ করে দিতে ভুলিনি।'

বৃষ্টি থেমেছে। তবলা মেরামতের দোকান থেকে সামান্যতম বোল্‌ও আর শোনা যায় না। ভিজে হাওয়ায় জানালার পাল্লা মাঝে মাঝে থর থর করে উঠছে। হঠাৎ অসহায় শিশুর মত একটা বালিশে মুখ ঢাকলেন ইন্দুলতা, তীব্র দ্রুত স্বরে বলে উঠলেন, 'কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, উপেনবাবু। আমি সারা জীবন মাইনর রোলের পাঁকে হাবুডুবু খেয়েছি, উনি একটার পর একটা গৌরবের সিঁড়ি টপকে গেছেন। আমাকে

তো কারুর মনেও নেই। আজও শোকসংবাদে দেখুন, সবাই ওঁর সাধনা, কৃতিত্ব, অধ্যবসায়ের কথা লিখেছে ; বার বার এসেছে কিঙ্কিণীর নাম, আমি যে আছি, কোনদিন ছিলুম, সে-কথাটাও কেউ উল্লেখ করেনি। ওঁকে আমার কলঙ্কের ভাগ দিতে পারলুম কই পরিমলবাবু।'

এবারও ইন্দুলতা আমার নামটা ভুল বললেন। কিন্তু শুধরে দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করলুম না।